বাংলার

প্রাথমিক কৃষিপাঠ

ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

এম্. এস্-সি., এম্. বি., এফ. সি. এস্., ডি. পি. এইচ্, ডি. টি. এম.

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১নং ডাঃ কার্তিক বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

খাবে ভাল
পর্‌বে কাল,
বাস ক'রবে কুঁড়ে
চাষ ক'রবে রাজ্য জুড়ে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
১নং ডাঃ কার্ত্তিক বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯
ফোন ঃ ৩৫-৩৩৪৩
[সর্ব্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯
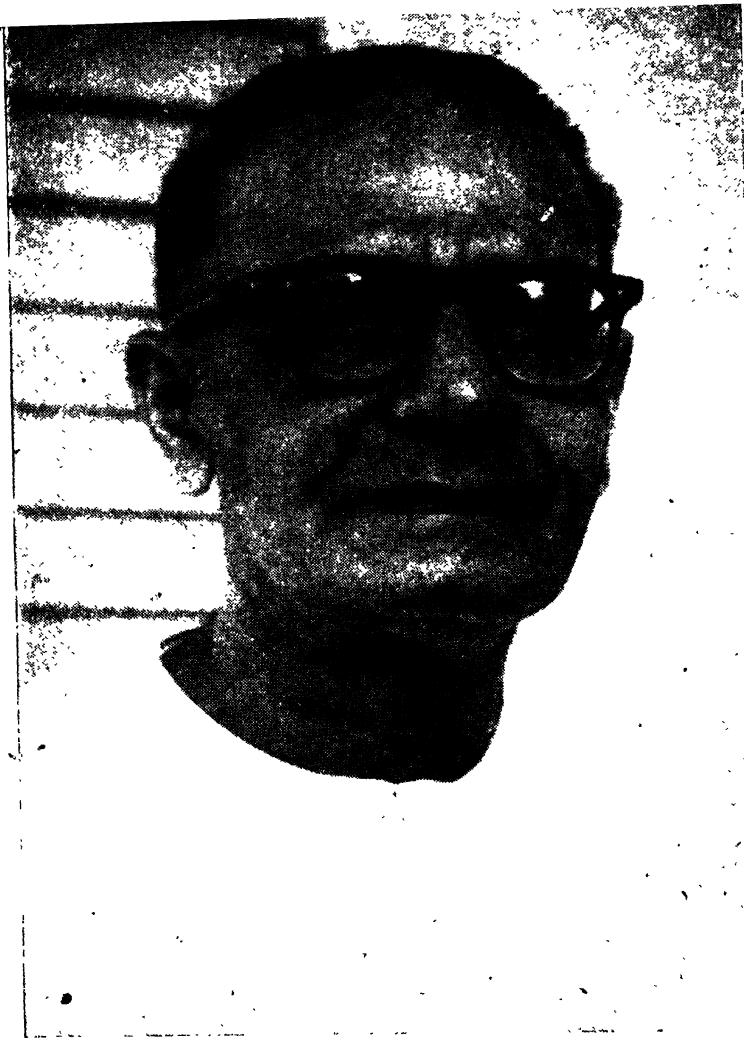
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী—তথা খাদ্যমন্ত্রী

মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের করকমলে—

খাবে ভালো ; প'রবে কালো ।

বাস ক'রবে কুঁড়ে ; চাষ ক'রবে রাজ্য জুড়ে ॥

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র কৃষি সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হইলেও ইহার কৃষিসম্পদ, অথবা চাষপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন প্রকার ধারণা নাই বলিলেই চলে। তার প্রধান কারণ আমাদের বিদ্যালয়ে এবিষয়ে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং এ সম্বন্ধে খুব সহজ ভাষায় লিখিত ছোট কোন বই নাই। মৈত্র মহাশয়ের বইখানি এই অভাব দূর করিবে। ইহাতে বাংলার কৃষি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য বেশ সহজ ভাষায় লেখা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বালকগণ ইহা পড়িয়া কৃষি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। যাহাতে তাহাদের মন এবিষয়ে সহজে আকৃষ্ট হয় তাহার জন্য কয়েকটি কবিতাও আছে। গ্রাম্য ছড়ার ন্যায় এগুলি সহজেই ছেলেদের মুখস্থ হইবে এবং এইরূপে কতকগুলি কৃষির নিয়মাবলী তাহাদের আয়ত্ত হইবে। বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষিত-গণও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে এমন অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন সহরের আবহাওয়ায় যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁহাদের জন্মে নাই। বাঙ্গালী মাত্রকেই আমি এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কলিকাতা
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র রচিত বাংলায় প্রাথমিক কৃষিপাঠ পুস্তকখানি ১৯৪২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তার ভূমিকায় ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার তার গুণগুলির বিবরণ দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় রচিত কৃষিসম্বন্ধীয় পুস্তক হিসাবে ইহাই ছিল প্রথম। সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় তাতে সন্নিবিষ্ট ছিল এবং সারাংশ সহজ পদ্যে রচিত হয়েছিল।

ডাক্তার মৈত্র তার এই পুস্তকখানার নূতন সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন দেখে সুখী হয়েছি। স্বাধীনতা লাভের পর দেশমাতাকে মনের মত ক'রে গড়বার উদ্দেশে আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রচনা করেছি। এগুলি সাফল্যমণ্ডিত করতে সবার প্রথম প্রয়োজন শস্য উৎপাদন বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। বর্ত্তমান পরিবেশে তাই অধিক শস্য ফলান সকলের একান্ত কর্ত্তব্যের স্থান গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে এই পুস্তকের নূতন ক'রে প্রচারের ব্যবস্থা বিশেষ সময়োপযোগী হয়েছে। ডাক্তার মৈত্রের রচিত এই পুস্তকখানা অধিক ফসল ফলাবার ব্রতে দেশবাসীকে উৎসাহিত করবে সন্দেহ নাই।

১৬ই জুলাই, ১৯৬০

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান আয়তন কমবেশী প্রায় ৩৩,৮০৫ বর্গমাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ২,৬২,৫০,০০০ (দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে দেশ বিভাগ ও উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে দারুণ দায়িত্ব লইতে হইতেছে তাহার অধিবাসীদের বাসস্থান ও খাদ্য বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে ৭৭৭ জনের বাস। কেরালা প্রদেশের পরই পশ্চিমবঙ্গে ঘনবসতি।

পশ্চিমবাঙ্গলার খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা আমাদেরই সমাধান করিতে হইবে। "নান্যঃপন্থা"। উৎপন্ন খাদ্যশস্যের হিসাবে পশ্চিম বাঙ্গলায় ২,৬২,৫০,০০০ লোকের মধ্যে ৬৮,০০,০০০ লোক বস্তুতঃ অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত থাকে।

আমার সম্পাদ্য প্রতিপাদ্যের উপরে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশে খাদ্যশস্যের ফলন বাড়াইতে হইবে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে হইবে, রাষ্ট্র চালনার খরচ কমাইতে হইবে, শিক্ষিতদের কৃষি-মনোবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। এই সকল উপায় কার্যকরী করিবার উপযোগী বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও পুরাতন আইনগুলির সংশোধন করিতে

হইবে। কৃষিক্ষেত্রে কচুরীপানা, লালপিঁপড়া, উই, শামুক, ইঁদুর, বাঁদর, কাঠবিড়ালীর উপদ্রব এবং গরু-ছাগল-মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর দ্বারা শস্যনাশ নিবারণকল্পে আইনপ্রণয়ন করিলে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ খাদ্যশস্য ও শাক-সব্জীর অপচয় বন্ধ করা যাইবে। আগামী ২০০০ সালে দ্বিগুণ জনসংখ্যার উপযোগী খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সম্মিলিত জাতির মহাধ্যক্ষ হামারশিল্ড মহোদয়ের উপদেশ মত জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিতে এখনই আমাদের বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন করিয়া ডিম ও পক্ষীর মাংস আমাদের খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে বাড়াইতে হইবে। মেষ, ছাগ, শূকর প্রভৃতি পশু পালন করিয়া মাংস ও অপরাপর অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

গো-মহিষ পালন করিয়া দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের চাহিদা মিটাইতে হইবে। গভীর সমুদ্রে মৎস্যের সন্ধান করিতে হইবে। নদী-নালা, খাল, বিল ও পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ বাড়াইয়া প্রোটীন খাদ্যের অভাব পূরণ করিতে হইবে।

নূতন ইস্পাত কারখানায় উৎপাদিত ইস্পাতে ১১০ তলা পর্য্যন্ত গৃহনির্ম্মাণ ও নানাবিধ পদ্ধতিতে চতুর্গুণ খাদ্য উৎপাদন, সৌরকর, বায়ু, জল ও নৈসর্গিক উপায়ে ও বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃত্রিম প্রোটিন উৎপাদন, প্রোটোপ্লাজমের উদ্ভব ও ট্রেসার মৌলিক পদার্থ (Tracer Elements) গুলিকে বৈজ্ঞানিক

প্রক্রিয়ায় মানুষের খাদ্য, ঔষধ ও তাবৎ সুখের কার্য্যে লাগাইতে হইবে।

বর্ত্তমান ক্রমবর্দ্ধমান মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের ফলে লোকক্ষয়ের চেষ্টা না করিয়া শান্তির কার্য্যে শক্তি নিয়োগ করিয়া আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সর্বাঙ্গীন কল্যান সাধনে কৃতসংকল্প হইব, ইহাই গ্রন্থকারের বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন।

———

সূচীপত্র

প্রথম পাঠ : কৃষিকার্য্য হীন নয় ... ১

দ্বিতীয় পাঠ : মাটির কথা ... ৩

তৃতীয় পাঠ : গাছের কথা ... ৫

চতুর্থ পাঠ : খাদ্য শস্য (তৃণ জাতীয়) ... ১২

পঞ্চম পাঠ : খাদ্য শস্য (ডা'ল জাতীয়) ... ২৬

ষষ্ঠ পাঠ : তৈল-বীজ শস্য ... ৫৪

সপ্তম পাঠ : শর্করা জাতীয় উদ্ভিদ ... ৬৬

অষ্টম পাঠ : মসল্লা, শাকসব্জি, তরিতরকারী ও পানের চাষ ... ৬৮

নবম পাঠ : চাষ-আবাদের কাল-নির্ণয় ... ৭১

পরিশিষ্ট ৭৬

বাংলার প্রাথমিক কৃষিপাঠ

——— ঃ * ঃ ———

প্রথম পাঠ

কৃষিকার্য্য হীন নয়

(১)

বাঁচতে হ'লে এ জগতে,
খাদ্য খাওয়া চাই।
কৃষিকার্য্য হ'তে মোরা
সেই খাদ্য পাই॥

(২)

চাষ যে করে, লোকে তারে
'চাষা' ব'লে থাকে
অনাদরের নয় সে কভু,
মান্য কর তাকে॥

(৩)

চাষ হ'তেই লক্ষ্মী লাভ,
রেখ ইহা মনে।
সমগ্র বাণিজ্য ফল
ফলে ক্ষেত কোণে ॥

(৪)

চাষ যে করে, লোকে তারে
"চাষা" ব'লে থাকে।
অনাদরের নয় সে কভু,
মান্য কর তাকে।

প্রকৃতি অনন্ত ধনরত্ন মাটির তলে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন; মানুষ তাহাকে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ফল ও শস্যরূপে টাকায় পরিণত করে। ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন সামগ্রার নাম কৃষিপণ্য। যে উৎপন্ন করে তাহাকে কৃষক বলে। ক্ষেত্রোৎপন্ন সামগ্রার সাহায্যে বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতির কাজকে বলে শিল্প এবং এই সকল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানী-রপ্তানীকে বলে বাণিজ্য। মানুষ সৎপরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিবে। কৃষিই শ্রেষ্ঠ সৎ জীবিকা। শ্রমবিমুখ ব্যক্তির আহার পাওয়া উচিত নহে।

প্রশ্ন

১। টাকা কড়ি কোথা হইতে আসে?

২। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কাহাকে বলে?

৩। কৃষিকার্য্য হীন নয় কেন?
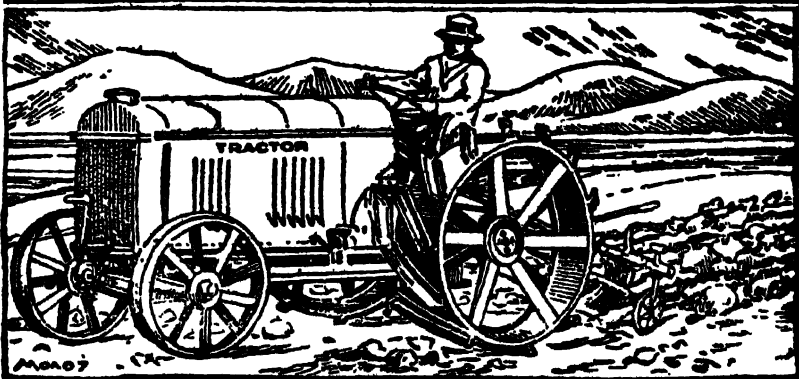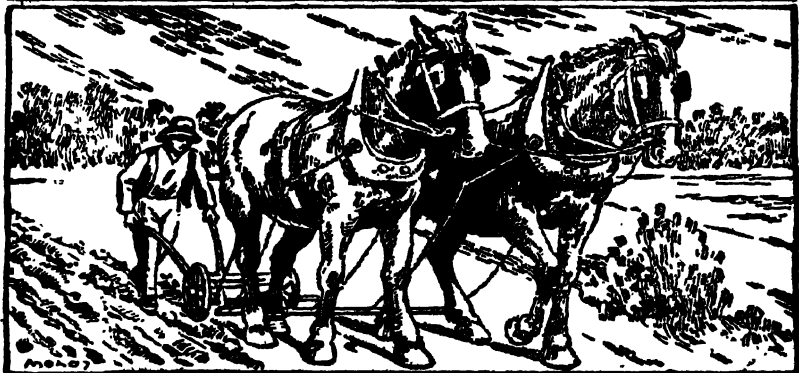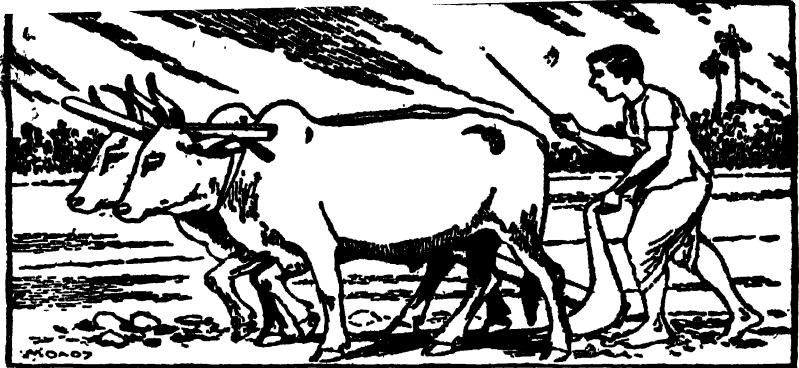
পশ্চিম বাংলার সমুদ্র সৈকত হইতে সু-উচ্চ পার্ব্বত্য জমি চাষে
'ভক্ত'রা বিবিধ উপায়ে চাষে ব্যাপৃত

দ্বিতীয় পাঠ

মাটির কথা

'এঁটেল', 'দোআঁশ', 'বেলে', 'চুনে' আর 'নোনা',
এই পঞ্চবিধ মাটি জানে সর্ব্বজনা।
দোআঁশ মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোক বলে,
দোঁয়াশে আমন ধান বড় বেশী ফলে।
চুনে কিংবা নোনা মাটি মন্দ অতিশয়,
ধানের ফলন এতে কভু নাহি হয়।

বাংলা নদীমাতৃক বলিয়া মাটির অবস্থা সাধারণতঃ কৃষির অনুকূল। কৃষিকাজের উপযোগী উর্বর পলিমাটি কম বেশী বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই নদীর দানস্বরূপ বিতরিত হইয়া থাকে।

নদীকূলবর্ত্তী স্থানসমূহের মাটি হালকা ও বালুকাময়; কিন্তু উহার ভিতরের মাটি এঁটেল। অনেক স্থান নীচু, ইহাদিগকে "ভড়" বলে। প্রতি বৎসর ঐ অঞ্চলে বর্ষার জলপ্লাবন রীতিমত হয় না। গঙ্গা ও পদ্মার পলি ব্রহ্মপুত্রের পলি অপেক্ষা সার হিসাবে কিছু নিকৃষ্ট। এই প্রকৃতির মাটিই বাংলায় বেশী। ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি অধিকতর উর্ব্বর; সেই জন্য বাংলার পূর্ব্বাঞ্চল গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোতে আনীত পলির জন্য বেশী উর্ব্বর এবং প্রতি বৎসর ঐ অঞ্চলে অনেক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই বাংলার পূর্ব্বাংশ বেশী শস্য-শ্যামলা এবং সজীবতাপূর্ণ।

ধান ও পাট এই অঞ্চলে যথেষ্ট জন্মে। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের নদী-তীরবর্ত্তী অনেক জমি বর্ষাকালে জলপ্লাবনে বাহিত পলিতে বেশ উর্ব্বরা হয়; কিন্তু আভ্যন্তরীণ অংশ বেশীর ভাগই এঁটেল মাটিতে পূর্ণ। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভূমিতে ধাতব খনিজ পদার্থ খুব কম। এই অঞ্চলের দোআঁশ মাটির অধিকাংশই প্রাচীন কালের গাছপালা হইতে জাত বলিয়া মনে হয়। এই সব অঞ্চলে আমন ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বিভিন্ন মাটির গুণ

(ক) বেলে মাটি শীঘ্র জল টানিয়া লয়, কিন্তু বেশী দিন জল ধরিয়া রাখিতে পারে না। দেখিতে দেখিতে জল শুকাইয়া যায়।

(খ) এঁটেল মাটিতে সহজে জল প্রবেশ করে না, প্রবেশ করিলেও সহজে শুকায় না। এঁটেল মাটিতে ধানের ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

(গ) দোআঁশ মাটিতে জলীয় অংশ অধিক সময় থাকে এবং গলিত গাছপালার সার অংশ অধিক থাকে। উর্ব্বরতার দিক দিয়া দোআঁশ মাটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দোআঁশ মাটিতে আমন ধানের ন্যায় বিভিন্ন ফল মূল ও তরি-তরকারী সবই ভাল হয়।

(ঘ) চুনে ও নোনা মাটিতে ধান হয় না। অন্য সার (ছাই ও সবুজসার) মিশাইলে তবে ভাল ফসল হইতে পারে। মাটির তারতম্য অনুসারেই বিভিন্ন চাষের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া বৃদ্ধি পায়, যেমন—আলু,

কচু, ওল, মূলা ইত্যাদি, ইহাদের জন্য ক্ষেত্রে অধিক চাষ দেওয়া আবশ্যক। কার্পাস, পাট, শণ প্রভৃতি সূত্রোৎপাদক উদ্ভিদের পক্ষে উহা অপেক্ষা কম চাষের প্রয়োজন। ধান, যব, কলাই ইত্যাদি শস্যের জন্য তূলাজাতীয় উদ্ভিদ অপেক্ষাও কম চাষের আবশ্যক। পান প্রভৃতি লতা-জাতীয় উদ্ভিদের জন্য জমিতে চাষ দেওয়ার প্রায় আবশ্যকই হয় না। জৈব সার ও কৃত্রিম সার প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন মাটির উর্ব্বরতা বাড়ানো সম্ভবপর এবং তাহাতে ফসলও ভাল হয়।

প্রশ্ন

১। মাটি কয় প্রকার?

২। প্রত্যেক প্রকার মাটির গুণ বর্ণনা কর।

৩। ধান চাষের জন্য কোন্ মাটি ভাল?

৪। চুনে ও নোনা মাটিতে ধান করিতে হইলে কি সার দিতে হয়?

তৃতীয় পাঠ

গাছের কথা

মানুষ যেমন আমিষ, তৈল, চিনিজাতীয় দ্রব্য, লবণ, জল ও ভিটামিন খাইয়া জীবন ধারণ করে বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণও তাহাদের পাতার দ্বারা বায়ুমণ্ডল হইতে সূর্য্য-কিরণের সাহায্যে এবং শিকড়ের ভিতর দিয়া মৃত্তিকা হইতে জল ও নানাবিধ লবণ

মিশ্রিত রস শোষণ করিয়া জীবনধারণ করে। উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির উপযোগী বিবিধ পদার্থকে সার বলা হয়। এই সার স্বভাবতঃই মাটিতে থাকে ; অভাব হইলে আবার কৃত্রিম সারও ব্যবহার করিতে হয়।

সার

উদ্ভিদের খাদ্য থাকে মাটির ভিতর
ক্ষয় হ'য়ে যায় তাহা বৎসর বৎসর।
এই হেতু ক্ষেতে সার দেওয়া প্রয়োজন,
সার নাহি দিলে শস্য হবে না কখন।

(ক) গোবর

সকল সারের মধ্যে গোবর প্রধান।
বিঘা প্রতি চারি গাড়ী করিবে প্রদান॥
কি এঁটেল, বেলে, চুনে হইবে উর্ব্বর।
ধান পাট দুই তাতে ফলিবে বিস্তর॥
এঁটেল মাটিতে জল করিবে ধারণ।
বেলে মাটি বহু জল করিবে শোষণ॥

কৃষিবিদ্ পণ্ডিতগণ পরীক্ষাদ্বারা দেখিয়াছেন যে, গোময় সারে উদ্ভিদ-জীবনের আবশ্যক সকল প্রকার দ্রব্যই আছে। এই জন্য গোময়ের সার অন্যান্য সার অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

ইক্ষু, ধান্য, পাট, কার্পাস প্রভৃতি চাষে গোময় সার বিশেষ ফলপ্রদ। গোময় সার রীতিমত প্রস্তুত করিতে পারিলে উহা

অন্যান্য সার অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কুক্কুট ও পারাবত জাতীয় পক্ষিগণের বিষ্ঠাও ফুলের বাগানের পক্ষে খুবই উপকারী ; ইহাদের সার অতি উৎকৃষ্ট। মুরগী ও পায়রার বিষ্ঠা শাকসব্জির চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। চামচিকার বিষ্ঠা ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপকারী। হাতী এবং উটের মলের সার শাকসব্জি চাষের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

মল-মূত্রের সার ব্যবহারে একটি বিশেষ ভয় এই যে, উহাতে পোকা জন্মিতে পারে। এরূপ সার প্রয়োগ করিলে এই পোকা বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষের অনিষ্ট সাধন করে। সেইজন্য সার পচাইবার সময় উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ তুঁতে ও চুন মিশ্রিত করা উচিত। একটি বড় গর্ত্ত করিয়া ইষ্টকাদি দ্বারা বাঁধিয়া তাহার একপার্শ্বে একটি স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন রাখিতে হয়। অনন্তর ঐ গর্ত্ত গোময় ও গোচনায় পূর্ণ করিয়া কিছু দিন রাখিলে তাহা হইতে রস নির্গত হইয়া নিম্ন দিকে সঞ্চিত হইবে। কিছুদিন পরে এই রস ও পচা গোবর তুলিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শুষ্ক হইলে বা অত্যন্ত পচিলে সারের তাদৃশ গুণ থাকে না। এজন্য ছায়াবিশিষ্ট স্থানে গর্ত্ত করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে তদুপরি গোমূত্র ঢালিয়া দেওয়া আবশ্যক। এ ভাবে ছয় মাস না গেলে গোবর সার ভাল হয় না। এই সার ক্ষেত্রে ছড়াইবার পূর্ব্বে ভূমি চষিয়া মই টানিয়া চূর্ণ মৃত্তিকা সমান করিতে হয় ; কারণ, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সমান না করিলে তরলতা প্রযুক্ত ইহা উচ্চ

স্থান হইতে গড়াইয়া নিম্ন স্থানে সঞ্চিত হইবে। সুতরাং, তাহাতে ক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানের সমান উপকার হইবে না। গাম্‌লায় যে সমস্ত চারা জন্মান যায় তাহাদের মূলে এই সার প্রদান করিলে তাহারা শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

গোময় অপেক্ষা গোমূত্র অতিশয় তেজস্কর সার। গোমূত্র পচাইয়া উহাতে খৈলের গুঁড়া মিশ্রিত করিলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট মিশ্র সার প্রস্তুত হয়ে থাকে। তদ্দ্বারা মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তির বিলক্ষণ উন্নতি হয়। গোমূত্রের ন্যায় ঘোটক, গর্দ্দভ, মেষ মহিষাদির মূত্রও কৃষিকার্য্যে বিশেষ উপকারী। কিন্তু সদ্য মূত্রের তেজ উদ্ভিদের পক্ষে দুঃসহ। তাহা চারার মুলে প্রদান করিলে চারা দগ্ধ-প্রায় হইয়া যায়। এজন্য উহাকে কলসে করিয়া কিছুদিন পচাইতে হয়। পচা গোময়-গোমূত্র, গাছের পচা পাতা, নদীতীরের বালি-মাটি এবং সামান্য এঁটেল মৃত্তিকা, এই চারি দ্রব্য সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া যে সার হয়, সেই সারে অধিকাংশ ফুলের গাছ অতিশয় তেজাল হয়।

(খ) ছাই

গোবর পোড়ালে হয় গোবরের ছাই,
'ছাই' সারে কিছু জোর দিয়ে থাকে তাই
এঁটেল ভূমিতে ছাই আলগা করে মাটি,
নোনাতে ও ছেয়ে ধান হয় পরিপাটি।

কাঠের ছাই, ঘুটের ছাই অপেক্ষা কচুরীপানার ছাই ধান ও পাটে বিশেষ উপকারী। লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙে ইত্যাদি লতানে গাছে ছাই দিলে অনেক সময় পোকা নিবারণ করে।

(গ) রেড়ীর খৈল

রেড়ীর খইল অতি তেজস্কর সার,
'বেলে'ও 'দোআঁশে' বড় হয় উপকার।
বিঘা প্রতি একমণ করিলে প্রদান,
অনুর্ব্বর জমিতেও ফেঁপে উঠে ধান।

বেলে ও দোআঁশ জমিতে রেড়ীর খইল বিশেষ কার্য্যকরী ; আলু ও ইক্ষু চাষে রেড়ীর খইল অত্যাবশ্যকীয়।

(ঘ) পাঁক

"পুরাতন পুকুরের জল সরে গেলে
কাল পচা পাঁক তার পাড়ে ফেল তুলে।
সেই পাঁক বিঘা প্রতি দাও বিশ গাড়ী,
প্রচুর হইবে ধান বর্ষ তিন ধরি।"

বাংলা দেশে নিম্নলিখিত চারি প্রকারের মাটিই সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।—(১) ভীটে মাটি, (২) পলিমাটি, (৩) পোড়া মাটি ও (৪) পাঁক মাটি।

(১) ভীটে মাটি—গ্রামের আবর্জ্জনার সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা আম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

(২) পলি মাটি—তামাক, আলু, কপি, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

(৩) পোড়া মাটি—উর্ব্বরা জমিতেও পোড়া মাটি দেওয়া যায়—বিশেষতঃ গোলাপ প্রভৃতির ফুলের বাগানে এবং লিচু, জাম, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের বাগানে।

(৪) পাঁক মাটি—পচা পুকুরের মাটিকে পাঁকমাটি বলে। ইহা সারবান পদার্থ। এই মাটি পুকুরের দাম, দল, হিঞ্চে, কলমী ইত্যাদি ও শাকসব্জী পচিয়া এবং মৎস্যাদি জলজন্তুর ধ্বংসাবশেষ দ্বারা গঠিত হয়। ফলবান বৃক্ষের পক্ষেও এই সার বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

(ঙ) মিশ্র-সার

উদ্ভিজ্জ সার, প্রাণিজ সার এবং ধাতু সার—এই তিন প্রকার সার মিশ্রিত হইলে তাহাকে 'মিশ্র সার' বলে।

(চ) সবুজ সার

বৈশাখ মাসেতে ভূঁয়ে ছুটো চাষ দিয়া,
শণ বা ধঞ্চের বীজ দাও ছড়াইয়া।
বিঘা প্রতি ছয় সের এই হারে দিবে,
দিনে দিনে চারাগুলি বাড়িয়া উঠিবে।
আষাঢ়ের শেষে গাছ তিন হাত হবে,
চাষ দিয়ে গাছগুলি ভেঙ্গে চুরে দিবে।

চাষ দিয়া দিন সাত ফেলিয়া রাখিবে,
গাছগুলি সব তবে পচিয়া উঠিবে।
তারপর চাষ দিয়া ধান পুঁতে দিও,
দ্বিগুণ হইবে ধান দেখিয়া লইও।

"সবুজ সার" অর্থ এই যে, কতকগুলি ফসলকে সবুজ অবস্থায় অর্থাৎ ফলবান হইবার পূর্ব্বেই চাষ দিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ক্ষেতের মাটির সহিত মিশাইয়া প্রস্তুত এক প্রকার সারযুক্ত মাটি।

প্রশ্ন

১ জমিতে সার দিতে হয় কেন?
২ আমাদের দেশের জমিতে কিরূপে সার হয়?
৩ আলু ও আখের চাষে কোন্ সার ভাল?
৪ ধঞ্চে সার কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?
৫ পাঁক সার কয় বৎসর পরে পরে দেওয়া ভাল?
৬ সবুজ সার কাহাকে বলে?
৭ মিশ্র সার কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়?
৮ কোন্ মাটিতে কোন ফসল প্রয়োগ করিতে হয়?
৯ ছাই সারের উপকারিতা কি?
১০ জীবজন্তুর মল-মূত্র কিরূপে ব্যবহার করিলে সারের কার্য্য করিবে?
১১ গোবর সার ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম কি?
১২ সার হিসাবে গোবর কি করিয়া রক্ষা করিতে হয়?

চতুর্থ পাঠ

খাদ্যশস্য (তৃণ-জাতীয়)

ধান

ধান, যব, গম, ভুট্টা, সয়াবিন প্রভৃতিতে আমিষ উপাদান, তৈল উপাদান, শর্করা, লবণ, জল এবং খাদ্য-প্রাণ (ভিটামিন) আছে। আমরা যাহা খাইয়া জীবন ধারণ করি তাহাই খাদ্য। সব্জী ও বিবিধ ফল-মূল ইহার অন্তর্গত হইলেও বাংলায় সাধারণতঃ ধান্যই খাদ্যশস্য নামে অভিহিত হয়। বাংলায় সাধারণতঃ (১) আমন, (২) আউস, (৩) বোরো, (৪) দিঘে, (৫) রায়দা—এই পাঁচটি প্রধান শ্রেণীর বিভিন্ন নামে পরিচিত ধান্য আছে।

(১) আমন ধান—বাংলার মাটির অবস্থাভেদে নানা স্থানে নানারূপ আমন ধান জন্মিয়া থাকে। উঁচু, নীচু ও মাঝারি জমি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আমন ধান হয়। চৈত্র, বৈশাখ মাসে আমন ধানের বীজ বপন করা হয়। আষাঢ় শ্রাবণে বন্যার জল যখন নীচু জমিতে আসে, তখন ধানের গাছগুলি জলের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই শ্রেণীর আমন ধানের গাছ অনেক সময় ১৫।১৬ হাত লম্বা হয়। মাঝারি জমির গাছ ৩।৪ হাত লম্বা হয়। আর উঁচু জমিতে যে আমন রোয়া হয়, বুনিলেও তাহার গাছ ২॥ হাতের বেশী লম্বা হয় না।

বাংলা দেশে কম বেশী প্রায় ২০ রকমের ধানের চাষ হয়।

তাহার মধ্যে ইন্দ্র-সাইল ও টেপীর ফলন বেশী ; এই ধানের ফলন বিঘা প্রতি দশ মণ হইতে পারে। পাটের জমিতে পাট কাটিয়াও এই সব ধানের চারা রোপণ করিতে পারা যায় এবং বপন অপেক্ষা রোপণে ফসল ভাল হয়।

(২) **আশু ধান্য বা আউস ধান**—৬০ দিনে এই ধান পাকে বলিয়া ইহার সংস্কৃত নাম ষষ্ঠিক ধান্য বা ষেটে ধান ; বাংলায় ইহাকে আশু ধান্য বলা হয়। আউস ধান উঁচু ও মাঝারি জমিতে চৈত্র বৈশাখ মাসে বপন করিতে হয়। ২।৩ হাত জলের মধ্যেও ইহারা বাঁচিতে পারে। আর যদি আউস ও আমন এক সঙ্গে বোনা হয় তবে ২।৩ হাত জলে আউস পাকিলে কাটিতে হয় ; তারপরে জলের সঙ্গে সঙ্গে আমনের গাছ বৃদ্ধি পায়। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকিলে তাহা কাটিয়া ঐ শুষ্ক জমিতে আবার কলাই ছিটান যায়। নদীর তীরবর্ত্তী পলি মাটিতে লেপী নামক আউস ছিটাইয়া বোনা যায়, মাঘ ফাল্গুনে বপন করিলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পাকে। জলী আউস নামে আর এক রকম আউস ধান আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটিতে ফাল্গুন চৈত্রে বোনা হয়। ইহাও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পাকে। এই জাতীয় আশু ধান্য বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলের একটি বিশেষ ফসল।

উঁচু জমিতে আউস রোপণে ফলন বিঘা প্রতি প্রায় ৮॥ মণ হইতে পারে। আধুনিক প্রথায় সার প্রদান ও জল সেচনে ফলন বাড়ান যায়।

আশু ধান্য সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার—আশু ধান্যের অনাবৃষ্টিসহতা এবং ফলনের আধিক্য গুণ এক সঙ্গে বৃদ্ধি করার একটি উপায় আছে। আশু ধান কাটিবার পর প্রায়ই মাটিতে রস থাকে, ঐ অবস্থায় জমি সত্বর চাষ না করিলে কাটা ধানের গোড়া হইতে কিছু পাতা ও ধানের শীষ বাহির হয়। ঐ শীষ হইতে আবার ধান হইবে। পূর্ব্বে যদি বিঘায় ৫৲ মণ হইয়া থাকে তবে এখন আর ১৲ মণ হইবে। এই বীজ পরবর্ত্তী বৎসরে বপন করিলে তাহা অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারিবে এবং বীজ বপন করিয়া রোপণ করিলে ফসন ৫৲ মণ স্থানে ৮৲ মণ হইবে। এইরূপে পর পর দুই বৎসর দো-কাটা করিলে ঐ আউস ধানই পরে আমন ধানে পরিণত হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এভাবে মিউটেশনের দ্বারা নূতন নূতন রকমারি ধান্য উৎপাদিত হইতেছে।

সম্প্রতি স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রেরণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক দিল্লীতে ধান চাষের নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিতেছেন। ইহাতে প্রতি বিঘায় ধানের ফলন বেশী হইবে ও একই জমিতে কম সময়ে বেশী ফলন ও বৎসরে একাধিক বার ফসল হইবে।

বীজের পরিমাণ—আমাদের দেশের কৃষকেরা বিঘায় দশ সের (কম বেশী ৮ কিলো) পর্য্যন্ত বীজ বপন করে। বীজ ভাল হইলে অবশ্য প্রতি বিঘায় ৵৫ সের বা ৪॥ কিলো বীজের অধিক দরকার হয় না।

আউস ধান কাটিয়া যাহারা মটর, কলাই ইত্যাদি ছিটাইবে তাহাদের জমিতে অন্য সার প্রয়োজন হয় না, বিশেষতঃ পলি মাটিতে। নতুবা উঁচু জমিতে বিঘা প্রতি ২০ গাড়ী গোবর সার প্রয়োজন।

(৩) **বোরো ধান ও রায়দা ধান**—জলা জমি, যেখানে ঘাস, বন, জলজ উদ্ভিদ্ ও মৎস্যাদির পচনের ফলে জমি উঁচু হইতেছে বা পলি পড়িতেছে, সে সব জমিতে বোরো ধান ভাল হয়। কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিয়া অগ্রহায়ণ পৌষে চারা'জো'তে রোপণ করিতে হয়। চৈত্র বৈশাখে এই ধান পাকে। বোরোর সঙ্গে রায়দার বীজ বপন দিলে, বোরো কাটার পর জল আসিলে রায়দার গাছ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে পাকে। রায়দা ধান পশ্চিম বাংলায় নাই। বোরো হাওড়া ও হুগলী জেলার কোন কোন বিলে সামান্য হয়।

(৪) **দিঘে ধান**—আউস ধানের জমি অপেক্ষা নীচু এবং আমন ধানের জমি অপেক্ষা উঁচু, এরূপ মাঝারি জমিতে কাল-বৈশাখীর প্রথম বৃষ্টিতে দিঘে ধানের বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিকে পাকে। ফলন বিঘা প্রতি ৭।৮ মণ হয়। এই ধান বাংলায় সাধারণতঃ উৎপাদিত হয় না।

বাংলায় ধানের বিশেষত্ব ইহাই যে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বোরো পাকে, আষাঢ় শ্রাবণে আউস পাকে, ভাদ্র আশ্বিনে কুরমণি দিঘে পাকে ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষে আমন পাকে। এভাবে বার মাসই ধান কৃষকের বাড়ীতে আসে।

বাংলা দেশে আমন, আউস, দিঘে ও বোরো, রায়দা ইত্যাদি অনেক রকম ধানের চাষ হয়। উত্তর বাংলায় আউস ও আমন তুল্য কৃষি। মধ্য বাংলায় আউসের চাষ আমনের অর্দ্ধেক। বাকী অংশে আউস আমনের দশমাংশ। বিল ভূমিতে এবং চর ভূমিতে বোরো ধান ভাল হয়। সমগ্র বাংলায় যে ধান হয়, তাহাতে সকল বাঙ্গালীর খোরাকী হয় না বলিয়া বহু কৃষক কৃষি ছাড়িয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতেছেন। বাংলা দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং শিল্পের দ্বারা অর্থ উৎপাদন ও অন্য দেশ হইতে খাদ্য ক্রয় করা ছাড়া আজ আর বাঙ্গালীর গত্যন্তর নাই।

প্রশ্ন

১। বাংলায় কয় জাতীয় ধান হয়?

২। বোরো ও রায়দার প্রভেদ কি?

৩। দিঘে ধান কখন বোনা হয় ও কখন পাকে?

৪। আমন সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৫। দো-কাটা আউস কাহাকে বলে?

৬। কোন্ জাতীয় ধানের ফলন বেশী?

(খ)   গম

গমের পক্ষে 'দোআঁশ' 'বেলে'
উপযুক্ত মাটি।
চারটে চাষ   পড়লে ভূঁয়ে
হবে পরিপাটি।
সোরা-ই হচ্ছে   গম ও যবের
উপযুক্ত সার,
কি বিঘাতে   ছড়িয়ে দেবে
সের তিন চার।
বিঘা প্রতি   পাঁচ সের
বীজ বুনিয়ে দেবে,
দিন দশেকের   মধ্যেই বীজ
অঙ্কুরিত হবে।
মাঘ মাসেতে   গম ও যবের
দেখা দেবে শীষ্,
শীষ বেরোবার   কিছু আগেই
দিবে একটা ছিচ।
চৈত্র মাসে   পাক্‌লে ফসল
কেটে আন্‌বে ঘরে,
আছাড় মেরে   গম ও যব
রাখ্‌বে পৃথক্ ক'রে।

বর্ষার পর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে চর জমি হইতে জল নামিয়া গেলে তিন চার বার চাষ দিয়া বিঘা প্রতি তিন চার সের সোরা ও রেড়ীর খৈল ছিটাইয়া মই দিয়া রাখিবে। একদিন পরে পাঁচ সের যব ও গমের বীজ ছিটাইয়া মই দিবে। শিশিরে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পাইবে। "ধন্য রাজার পুণ্যদেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ"। মাঘের শেষে সামান্য বৃষ্টি হইলে উৎকৃষ্ট গম ও যব হইবে। অনেকের ভুল ধারণা যে, বাংলায় গম হইবে না, কিন্তু যদি তাঁহারা বাংলার চরগুলিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সার দিয়া চাষ করিয়া কার্ত্তিকের শেষ বা অগ্রহায়ণের প্রথমে বীজ বপন করেন, তাহা হইলে যথেষ্ট গম উৎপন্ন হইবে এবং দেশে খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদেশ হইতে ধান চাউল আমদানী না করিয়া এক বেলা রাত্রে রুটি খাইলে স্বাস্থ্য ও অর্থ দুই লাভ হইবে। বাংলা ও সর্ব্বভারতে উপযুক্ত জমিতে ব্যাপকভাবে গম চাষ আরম্ভ করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারত খাদ্য-ভাণ্ডারে পরিণত হইতে পারে।

প্রশ্ন

১। বিঘা প্রতি যব ও গমের কত বীজ লাগে?
২। যব ও গম বুনিতে মাটিতে ক'টা চাষ দরকার?
৩। যব ও গমের পক্ষে সার কি?
৪। কোন্ মাসে যব ও গম বপন ও কোন্ মাসে কাটা হয়?
৫। খাদ্য হিসাবে গমের প্রচলন কেন ভাল?

যব (বার্লি)

চাষ প্রণালী—ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই বার্লি অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশে ও বাঙ্গালা দেশে গম, ছোলা, মটর, মসূর প্রভৃতি শস্যের সহিত যব গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে আলুর জমির দাঁড়ায় বার্লি বেশ ভাল জন্মে। উর্ব্বরা জমিতে গম ও বার্লি উভয় ফসল একসঙ্গে জন্মিয়া থাকে। গমের গাছ জমির গভীর মাটিতে শিকড় চালায়; এই কারণে গম ও বার্লি এক জমিতে বপন করিলে উভয় ফসলই অতি উত্তম হয়। গম অপেক্ষা যবের বীজ একটু পূর্ব্বে বপন করা উচিত। এক বিঘা জমিতে বার্লি বুনিতে হইলে পনর সের বীজ আবশ্যক হয়। যদি বীজ বেশ ভাল হয় তবে সাত আট সের হইলেও চলে। যবের চাষে গমের ন্যায় নিড়ান বা জল সেচনের আবশ্যক করে না। গমের অপেক্ষা যবে পোকাও খুব কম ধরিয়া থাকে।

সার—এক বিঘা জমিতে পঞ্চাশ মণ গোবর সার, অথবা যখন চারাগুলি পাঁচ ছয় ইঞ্চি লম্বা হয় তখন বার সের পরিমাণ সোরা ছড়াইয়া জমিতে জল সেচন করিলে ভাল হয়।

কর্ত্তন ও মাড়াই—শস্যগুলি পাকিয়া উঠিলে গাছ কাটিয়া ফেলা উচিত। ক্ষেত্রে দুই এক দিন ফেলিয়া রাখিলে শস্যগুলি শুষ্ক হয়। যখন বেশ শুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তখন গাছগুলি খামারে আনিয়া মাড়িয়া শস্য পৃথক করিয়া লইলেই হইল।

আমেরিকার যব—আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশে 'মেরি আউট' নামে এক প্রকার যব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট বার্লি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই যবের বীজ কালিফর্ণিয়া হইতে সরকারী প্রচেষ্টায় আনিয়া বাংলায় ইহার প্রবর্ত্তন করা আশু প্রয়োজন।

দেশী বার্লি প্রস্তুত প্রণালী—দেশী বার্লি দুই তিন রকমের আছে। বার্লি প্রস্তুত করিতে হইলে যবগুলি দুই তিন ঘণ্টার জন্য জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জল হইতে তুলিয়া উহা তিন চার ঘণ্টার জন্য বাতাসে বেশ শুষ্ক করিয়া ঢেঁকিতে অথবা ডাউল ভাঙ্গিবার যন্ত্রে, অথবা বড় হামানদিস্তা দিয়া আস্তে আস্তে খুসিয়া খোসাগুলি বাহির করিতে হয়। যাহাতে খোসাগুলি বেশ ছাড়িয়া যায় এবং যবের চাউল বেশ পরিষ্কার হয় তদ্বিষয়ে যত্নের আবশ্যক। খোসা বেশ পরিষ্কার হইলে উহা রৌদ্রে দিয়া একটু শুষ্ক করিয়া যাঁতায় ভাঙ্গিয়া সূক্ষ্ম চালনীর দ্বারা চালিলেই ভাল বার্লি প্রস্তুত হইল। একটু সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করিলে উহা বিলাতী বার্লি অপেক্ষা কোন অংশে হীন হইবে না।

যবের ছাতু—যব প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া অল্প বল প্রয়োগে ঢেঁকিতে খুসিয়া খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। এই প্রকারে যবের যে চাউল বাহির হয় তাহা অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া পুনরায় ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া করিতে হয়। গুঁড়াগুলি চালনী দ্বারা চালিলে আটার ন্যায় বেশ উপাদেয় ছাতু প্রস্তুত হয়।

বিয়ার মদ্য—বার্লি হইতে অতি উৎকৃষ্ট 'বিয়ার' মদ্য প্রস্তুত হয় বলিয়া এদেশ হইতে বহু পরিমাণ বার্লি ইউরোপ খণ্ডে রপ্তানি হইয়া থাকে। মদ্য বা মদ্যঘটিত হাল্‌কা মাদক দ্রব্য হিসাবে 'বিয়ার মদ্য' রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহার করা ভাল। ভারতেও ইহার কারখানা প্রবর্ত্তন করিলে একটি জাতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এ বিষয়ে অত্যধিক গোঁড়ামি বিজ্ঞানসম্মত নহে।

(গ) ভূট্টা, জনার বা মক্কাই

পৃথিবীতে যত জিনিষের চাষ হয়, তাহার মধ্যে পরিমাণের হিসাবে ভুট্টা তৃতীয় স্থানে আছে। শীত ভিন্ন সমস্ত ঋতুতেই ইহার চাষ হয়; তবে বাংলায় চৈত্র ও বৈশাখ মাসের কাল বৈশাখীর বৃষ্টিতেই ইহার চাষ প্রশস্ত। ইহার আটা, রুটী, ছাতু এবং কাঁচা পোড়াইয়া খাওয়া যায়। ইহার গাছ হইতে চিনি, ফুল হইতে মদ, খোসা হইতে কাগজ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প-সামগ্রী প্রস্তুত হয়।

যদি থাকে টাকা করবার গোঁ
তবে চৈত্র মাসে ভুট্টা রো।
দোআঁশ মাটির ঢালু জমি
বার চার চষ,
বিঘা প্রতি গুবরে সার
দিও গাড়ী দশ।

চৈত্র মাসে ভুট্টার বীজ
করিও বুনন,
গৃহে তব অন্নাভাব
হবে না কখন।
দিনে দিনে চারাগুলি
বাড়িয়া উঠিবে,
বিদে দিয়ে ঘাস যত
নিড়াইয়া দিবে।
ভাদ্রের প্রথমে কিম্বা
শ্রাবণের শেষ,
গাঁইটে গাঁইটে ভুট্টা
ধরিবে অশেষ।

প্রশ্ন

১। কোন্ সময়ে ভুট্টা বপন করিতে হয়?
২। ভুট্টার জন্য জমিতে ক'টা চাষ দিতে হয়?
৩। কতকগুলি ঢালু জমির স্থান নির্ণয় কর।
৪। কোন্ সময়ে ভুট্টা ধরে?
৫। ভুট্টা হইতে আমরা কি কি পাইতে পারি?

কাওন—ইহা আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বপন করতে হয়। বিঘা প্রতি সাত পোয়া বীজের আবশ্যক হয়। আশ্বিন মাসে পাকিয়া থাকে। বিঘা প্রতি ২ মণ হিসাবে কাওন ফলে। জমি বালুকাময় ও শুষ্ক হইলেই ফসল ভাল হয়।

বজরা—ইহা শ্রাবণ মাসে বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি তিন সের বীজের আবশ্যক। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ফসল উৎপন্ন হয়। ফলন বিঘা প্রতি মোটামুটি ২ মণ হয়। শুষ্ক ও বালুকাময় জমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। বজরা একটী পশু-খাদ্য।

শ্যামা—ইহা আষাঢ় মাসের শেষে বপন করা হয়। বিঘায় তিন পোয়া হিসাবে বীজ আবশ্যক হয়। আশ্বিন মাসে শ্যামা পাকিয়া থাকে ও বিঘা প্রতি ২ মণ হিসাবে ফলন হয়। জমিতে সেচ দিবার আবশ্যক করে না। ইহা একটি পশু-খাদ্য।

কোদো—ইহা আষাঢ় মাসের শেষভাগে বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি তিন পোয়া বীজের আবশ্যক হয়। কোদো আশ্বিন মাসে পাকিয়া থাকে; বিঘা প্রতি তিন মণ হিসাবে ইহার ফলন হয়। কোদো জঙ্গলময় ও নীরস বালুকাময় জমিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাও একটি পশু-খাদ্য।

যই বা যুয়ার

চাষপ্রণালী—বঙ্গদেশে যই খুব কমই উৎপাদিত হয়। ইহা বাঙ্গালা দেশের আউস জমিতে জন্মিতে পারে। আউস ধান কাটা হইলে অথবা পাটের জমি হইতে পাট স্থানান্তরিত হইলে বিঘা প্রতি ৫০ মণ গোবর সার দিয়া জমিতে ৩।৪ বার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটী বেশ পরিষ্কার ও গুঁড়া করা আবশ্যক।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের প্রথম বৃষ্টি হইলে জমি তৈয়ার করিয়া বিঘা প্রতি ৮ সের হিসাবে বীজ জমিতে ছড়াইয়া একবার চাষ ও মই দিতে হয়। বীজগুলি তুঁতের জলে ভিজাইয়া নিলে পোকা ধরিবার সম্ভাবনা থাকে না ও বেশ তেজস্কর থাকে। যই-এর জমি খুব উর্ব্বরা না হইলেও চলে, উহা সকল প্রকার জমিতে উৎপাদিত হইতে পারে এবং গম ও যবের ন্যায় ইহার চাষে বিশেষ যত্ন লইবার আবশ্যক করে না। চারাগুলি বাহির হইলে জমিতে বিঘা প্রতি ১০ সের সোরা দিয়া একবার জল সেচন করিয়া নিড়ান দিতে হয়।

শস্য সংগ্রহ—শস্যগুলি সংগ্রহ করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যই যখন বেশী পাকে নাই তখন গাছগুলি কাটিয়া একত্র করিতে হয়; নতুবা শস্য বেশী পাকিয়া গেলে জমিতে ঝরিয়া পড়িবে ও খড়গুলি খারাপ হইয়া যাইবে। ইহার খড় গরু ঘোড়ায় বেশ পছন্দ করে এবং ধানের খড় অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট পশু-খাদ্য। কোন কোন স্থানে যই গরুর খাদ্যের জন্য আবাদ করা হয়। ইহা পাকিবার পূর্ব্বে ২।৩ বার কাটিয়া গরুর খাদ্য হিসাবে রক্ষিত হয়; শেষভাগে যাহা থাকে তাহা বীজের জন্য রাখিয়া দেয়।

উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ—একবিঘা জমিতে ৬।৭ মণ যই উৎপন্ন হয়। ইহা ৩।৪ মাসের মধ্যে পাকিয়া থাকে।

সারি গাঁথিয়া আধ হাত তফাতে যই-এর বীজ বপন করিতে হয়। চারাগুলি একটু বড় হইলে একবার নিড়ান আবশ্যক।

যদি বীজগুলি রোপণ করিবার পর ৩।৪ দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হয়, তবে একবার জল সেচন করা আবশ্যক। অতিবৃষ্টি হইলে ছোট ছোট চারাগুলি নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু যদি চারাগুলি ১ হাত পরিমাণ উচ্চ হয়, তবে উহার কোন ক্ষতি হয় না। ফাল্গুন কিংবা চৈত্র মাসে বীজ বপন করিতে হয় এবং বৃষ্টি না হইলে সেচ দেওয়ার আবশ্যক হয়।

সার—বিঘা প্রতি ৫০ মণ গোবর এই চাষের পক্ষে যথেষ্ট। বর্ষা নামিবার পূর্ব্বে গাছগুলিতে একবার মাটি দেওয়া উচিত। ইহা কখন কখন অড়হর ও তূলার সহিত রোপণ করা যায়।

পোকা—যুয়ার গাছে প্রায়ই ধসাপোকা ধরে। বীজগুলি তূঁতের জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলে, অথবা ফরমালিনে ডুবাইয়া রোপণ করিলে পোকা ধরিতে পারে না। যদি পোকা ধরিবার বিশেষ সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়, তবে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে না বুনিয়া আষাঢ় মাসে বুনিলে পোকার হাত হইতে অনেকটা এড়াইতে পারা যায়।

চাষের বিস্তার—যে স্থানের লোকেরা এই চাষ জানে না, তথায় এই চাষের চলন করা বড়ই কঠিন। মধ্যভারতে **মতিচূর যুয়ার** নামে একজাতীয় যই আছে, তাহার চাষ বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত করা যাইতে পারে।

পশু-খাদ্য—যুয়ার প্রধানতঃ পশু-খাদ্যের জন্যই চাষ হইয়া থাকে। যুয়ার আরও এক জাতীয় আছে যাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

জাতি-চীনা—ইহা মাঘ ফাল্গুন মাসে বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩ তিন সের হিসাবে বীজের আবশ্যক হয়। ইহা ৩ মাসে পাকিয়া থাকে ও বিঘা প্রতি ২॥৹ বা ৩ মণ হিসাবে ফলে।

উৎপত্তি স্থান—ইহা প্রধানতঃ দিল্লী, মিরাট ও হিসার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। দাক্ষিণাত্যে পুনা, আমেদনগর, সেতারা প্রভৃতি স্থানে অনেক যই চাষ হয়। যই ঘোটকের খাদ্যের জন্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতে ঘোটকের খাদ্যের জন্য ছোলা ও খড়ের সহিত অনেক সময় যই মিশাইয়া দেওয়া হওয়া থাকে।

পোকা—যই গাছের শীষে এক প্রকার পোকা ধরে। উহাকে 'ধসা পোকা' কহে। বীজগুলিকে ফরমালিনে ভিজাইয়া বপন করিলে পোকা ধরিতে পারে না।

খাদ্য শস্য (ডা'ল জাতীয়)

ডাঙ্গা জমি, এঁটেল মাটি,
ডাল হয় তায় পরিপাটি।

(কলাই)

ভাদ্রের চারি, আশ্বিনের চারি
কলাই রোব যত পারি।
পলি মাটিতে দিয়ে চাষ,
বিঘায় আট সের বুন মাস।

অগ্রাণ মাসে ধরবে শুঁটি
পৌষের শেষে আনবে কাটি।

সমস্ত ডালের সাধারণ নাম কলাই। ভাদ্র মাসের ৪ দিন হইতে আশ্বিন মাসের প্রথম পর্য্যন্ত পলিমাটির উঁচু জমিতে ৩।৪ বার চাষ দিয়া কলাই-এর বীজ বিঘা প্রতি ৮ সের বুনিতে হয়। কলাই মাঘ মাসে পাকে।

মটর

জাতি—শীত ঋতুতে মটর প্রায় সর্ব্বত্রই কমবেশী উৎপাদিত হয়। মটরকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ঃ—বিলাতী ও দেশী মটর। বিলাতী মটর আকারে বড় হয় এবং দেশী মটর আকারে ছোট হয়। ছোট দেশী মটরকে কেহ কেহ পায়রা মটর কহে, ইহার ডাউল খেসারীর ডাউলের ন্যায় ছোট। আর এক প্রকার মটর আছে উহাকে কাবুলী মটর কহে। কাবুলী মটর দেখিতে সাদা ও আকৃতিতে বড়। ইহা আকৃতিতে বড় ও দেখিতে অনেকটা ছোলার ডাউলের ন্যায়।

বীজের পরিমাণ ও বপন সময়—এক বিঘা জমিতে মটর বুনিতে হইলে কাবুলী বড় মটর ৭ সের ও ছোট মটর ৫ সের আবশ্যক করে। মটর বীজ কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বপন করা উচিত। শুঁটী বিক্রয়ের জন্য মটর বুনিতে হইলে আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বপন করাই ভাল।

জমি নির্ব্বাচন ও চাষ—মটরের জমি বেশ তেজস্কর ও মাটী দোয়াঁশ হইলে ভাল হয়। যদি জমিতে বেশ তেজ না থাকে, তবে বিঘা প্রতি ৮০ মণ গোবর সার এবং ছয়টী চাষ ও মই দিয়া মাটী বেশ গুঁড়া করিতে হইবে। অনন্তর বীজ ছড়াইয়া আর একটী চাষ ও মই দিতে হয়। মটর জমির চাষ অতিশয় গভীর হওয়া দরকার, নতুবা গাছ ভাল হয় না। যদি শীতকালে বৃষ্টি না হয়, তবে গাছগুলিতে দু'একবার জল সেচন করা আবশ্যক।

ফসলের সময়—মটর মাঘ ফাল্গুনে পাকিয়া থাকে। বপনের সময় অনুযায়ী ফসল পাকে। মটরের শুঁটী যথেষ্ট বিক্রয় করিতে পারা যায় সেই বিষয় নজর রাখিয়া একটু সকাল করিয়া মটর বপন করা উচিত।

সয়াবিন

সয়াবিন মটর ডাল জাতীয় শস্য। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে সয়াবিনের স্থান খুব উচ্চে।

বীজ বুনিবার নিয়ম—প্রতি বিঘা জমিতে দুই হইতে আড়াই সের বীজের প্রয়োজন। সারি বাঁধিয়া দুই ফুট তফাতে তফাতে একটীর পর একটী বীজ মাটীর দুই ইঞ্চি নীচে পুঁতিয়া দিতে হইবে। যে বীজের গাছ বেশী বড় হইবে, সেখানে বোনার দূরত্বও বেশী হইবে। বীজ পোঁতার দিন-সাতেক পরে সাধারণতঃ গাছ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

ফসলবাতি—পাঁচ সপ্তাহ পরে সয়াবিনের গাছে ছোট ছোট ফুল ফোটে। ফুল ফোটার তিন সপ্তাহ পরে সয়াবিন ফলিতে থাকে। সয়াবিন পরিপক্ক হইলে গাছ হইতে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়ে। সয়াবীজ লাগান হইতে ফসল পর্য্যন্ত মাত্র তিন মাস সময় লাগে। সয়াবিন পাকিবার পরে গাছের গোড়াগুলি মাটিতে থাকিলে তাহা পচিয়া মাটির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ইহার পর সয়াবিনের ছড়া হইতে বীজ বাহির করা হয়। প্রত্যেক ছড়ায় চার হইতে পাঁচটী বীজ থাকে। বাংলার জমিতে গড়ে বিঘা প্রতি পাঁচ হইতে ছয় মণ ফসল ফলিয়া থাকে। অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই এই ফসলের পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশে সয়া-চাষের উপযোগী অঞ্চল—বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল, বিশেষতঃ উত্তর এবং পশ্চিমাংশ সয়া-চাষের বিশেষ উপযোগী। নবদ্বীপের প্যাক কোম্পানীর এস. গোস্বামী, হাওড়া শালকিয়ায় মেসার্স ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ নদীয়ার শান্তিপুরের নিকট একটী গ্রামে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সয়া চাষ করিতেছেন এবং সয়াবিন-জাত নানারূপ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন। বাংলার কয়েকটী স্থান হইতে আমরা সয়াবিন চাষের খবর পাইয়াছি। বাংলা দেশের মত সমতল জমিতেও যে সয়াবিন উৎপন্ন করা যায় তাহা সরকারী কৃষি বিভাগ প্রমাণ করিয়াছে।

চাষের সময়—বর্ষার শেষ দিকে বা পরেই সয়াবিন চাষ

করিতে হয়। বাংলাদেশের পক্ষে ভাদ্র এবং আশ্বিন মাস সয়াবিন চাষের উপযুক্ত সময়। জলের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে ফাল্গুন মাসে বীজ বপন করিয়া অনেক সময় বৈশাখের শেষে ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

উপযুক্ত জমি ও সার—ডাঙ্গা জমি সয়াবিন চাষের উপযুক্ত। মাটি দোয়াঁশ হওয়া দরকার; এঁটেল মাটিতে সয়াবিন চাষ করা চলে না। জমি এমন হওয়া চাই যেন সেখানে বর্ষার জল না আঁটকায়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেখানে বৃষ্টি কম হয়, যেমন পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে, বৃষ্টির জল না পাইলে ৫ হইতে ১০ দিন অন্তর ক্ষেতে জল সেচন করা দরকার। সারের ব্যবস্থাগুলি সহজে করা যায়। মাটিতে এক জাতীয় বীজাণু থাকিলে সয়াগাছ ভাল হয়; তবে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের মাটিতে এই বীজাণু জন্মাইবার প্রয়োজন হয় না। কারণ বীজের সহিত যে সামান্য জীবাণু লাগিয়া থাকে তাহার ফলেই বাংলার মাটিতে সয়াবিন গাছ বেশ সতেজ ও পুষ্ট হয়। উপযুক্ত জমি হওয়া সত্ত্বেও যদি জমিতে সয়াবিন গাছ ভাল না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই জমিতে উপযুক্ত জীবাণুর অভাব ঘটিয়াছে। এক্ষেত্রে যে সমস্ত জমিতে সয়াবিন গাছ ভালভাবে জন্মিয়াছে সেই জমি হইতে কিছু মাটি আনিয়া বীজ রোপণের পূর্ব্বে বীজের সঙ্গে মিশাইয়া দিলেই সয়াবিন গাছ ভাল জন্মিতে পারে। তবে জমিতে বিঘা প্রতি দুই তিন গাড়ী পুরাতন গোবর-সার ছড়াইয়া

দিতে পারিলেই সব চেয়ে ভাল হয়। ইহা একদিকে যেমন সহজলভ্য, অপরপক্ষে দামেও যথেষ্ট সস্তা।

হাল চাষ—সয়াবিন চাষের জমিতে হাল চাষের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেক জমিতে তিন চার বার টানা হাল দেওয়া দরকার। জমির মাটি খুব ঝুরঝুরে করিয়া লইতে হইবে এবং মাটি কোপান একটু গভীর হওয়া চাই।

বিঘা প্রতি আয়—আজকাল বাজারে সয়াবিনের দাম প্রতি মণ মোটামুটি ৩০.০০ টাকা। সুতরাং সয়াবিনের চাষের খরচ বাদে বিঘা প্রতি আয় প্রায় ৫০।৬০ টাকার উপরেও হইতে পারে। কাজেই ইহার চাষ বেশ লাভজনক।

সয়াবিনের ব্যবহার—সয়াবিন পিষিয়া আটা প্রস্তুত করা যায়। এই আটা হইতে নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক চীন দেশেই প্রায় চারিশত প্রকার খাদ্য সয়াবিন হইতে প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে দুধ এবং তেল হিসাবে সয়াবিনের ব্যবহারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সয়াবিনের দুধ কলিকাতায়ও কিছু কিছু প্রস্তুত হইতেছে। সয়াবিনে শর্করা জাতীয় উপাদানের অল্পতা হেতু বহুমূত্র রোগীর পক্ষে ইহা একটি আদর্শ খাদ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যদিগের খাদ্য হিসাবে সয়াবিনজাত দ্রব্যের ব্যবহার খুবই বেশী ছিল। জার্মানরা 'আয়রণ রেশন পিল' বলিয়া যে বস্তু সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে খাইতে দিত তাহা এই সয়াবিনের প্রোটিন হইতে প্রস্তুত। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, যে দেশে সয়াবিনজাত খাদ্যের প্রচলন যত

অধিক সে দেশের লোক সাধারণতঃ তত কর্ম্মপটু, পরিশ্রমী ও সমধিক উন্নত।

খাদ্য ব্যতিরেকেও সয়াবিনের ব্যবহার বর্ত্তমান জগতে অনেক প্রকারের। এক সয়াবিন তেল হইতেই নানাপ্রকার সাবান, রং, মোমবাতি, কৃত্রিম রবার, অয়েলক্লথ, বার্ণিস, ছাপার কালি প্রভৃতি বহুবিধ শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী হইয়া থাকে। সয়াবিন হইতে কেজিন এবং কেজিন হইতে বহুপ্রকারের সামগু প্লাস্টিক্স্ প্রস্তুত হইতেছে। বহুপ্রকারের শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থও জার্ম্মানরা এই সয়াবিন হইতে তৈয়ারী করিতেছে। আমেরিকাতে মোটর এবং এরোপ্লেন প্রভৃতির বিভিন্ন অংশ সয়াবিন-প্লাস্টিক্স্ হইতে নির্ম্মিত হইতেছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগে যেরূপ খাদ্যসামগ্রী হিসাবে, তেমনি শিল্পক্ষেত্রেও সয়াবিন এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। ইহা সত্যই চীনের "যাদু-বীজ"।

সয়া চাষের প্রয়োজনীয়তা—ভারতবর্ষের ন্যায় গরীব দেশে জান্তব দুধের, তথা ছানাজাতীয় খাদ্যের অভাব খুব বেশী; কাজেই এখানে সয়াবিনের উদ্ভিজ্জ দুধ হইতে ছানাজাতীয় খাদ্যের সে অভাব যথেষ্ট পূরণ হইতে পারে।

সয়াবিন হইতে কয়েকটী আহার্য্যের প্রস্তুত-প্রণালী—সয়াবিন কি কি প্রকারে খাদ্য হিসাবে বাংলাদেশে প্রচলিত হইতে পারে, নিম্নে তাহার কয়েকটী নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। কেবল মাত্র কয়েকটী খাদ্য দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী প্রদত্ত হইল। ইহা ছাড়া বহু প্রকারের আহার্য্য এই সয়াবিন হইতে প্রস্তুত

হইতে পারে এবং বাঙ্গালীর দৈনন্দিন রুচিকর খাদ্য হিসাবে বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারে।

সয়াবিন ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে অনেক ক্ষেত্রেই ইহাকে তিন ঘণ্টা হইতে চার ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। এই সময়ের কম ভিজাইলে সয়াবিন শক্ত থাকে এবং বেশী ভিজান হইলেও আবার সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হয়। উপযুক্তরূপে ভিজাইয়া রাখিলে সয়াবিনের যে সামান্য তিক্তভাব থাকে তাহা অনেকটা নষ্ট হইবে এবং দানাগুলি বেশ নরম হইবে।

সয়াবিন ভাজা—সয়াবিন (ভিজান) লইয়া তেল, নুন এবং শুক্না লঙ্কা প্রভৃতির দ্বারা যে প্রকারে কড়াই শুঁটি ভাজা হয় ঠিক সেই প্রকারে ভাজা যায়। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর।

সয়াবিনের ডা'ল—সাধারণ ডা'ল যে প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয় সয়াবিন (ভিজান) হইতেও সেই প্রকারে ভাল ডা'ল প্রস্তুত করা যায়।

তরকারি—যে সব তরকারিতে ভিজা ছোলা ব্যবহার করা হয় তাহার পরিবর্ত্তে ভিজা সয়াবিন দিলে স্বাদ এবং পুষ্টি যথেষ্ট বাড়ে। ডাল্না, চপ, ছক্কা, ঘণ্ট, শাক্ ভাজা, শুক্ত প্রভৃতির সহিত ভিজান সয়াবিনের ব্যবহার চলে। ডা'ল বাঁটার মতন করিয়া সয়াবিন বাঁটিয়া—দশ আনা ব্যাসন্ ছয় আনা সয়াবিন-বাঁটা দিয়া নানারূপ বড়ি ও বড়া ভাজা যাইতে পারে। ডা'ল এবং সয়াবিন স্বতন্ত্র সিদ্ধ করিয়া দশ আনা ছয়

আনা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একত্রে বাটিয়া ধোঁকা রান্না করা যাইতে পারে।

খিচুড়ি—সাত আনা ডা'ল, দুই আনা ভিজান সয়াবিন এবং সাত আনা চাউল দ্বারা খিচুড়ি করা যায়। ইহা ছাড়া এক ভাগ ভিজান সয়াবিন এবং তিন ভাগ চাউল একত্রিত করিয়া ঠিক একই উপায়ে চীন, ফরমোসা প্রভৃতি দেশে সয়াবিন খিচুড়ি প্রস্তুত করা হয়। ইহা খাইতে খুব মুখরোচক এবং পুষ্টিকর। সয়াবিনের খিচুড়ি ঐ সমস্ত দেশে একটি রুচিকর ও লোভনীয় খাদ্য।

সয়াবিনের আটা—আটা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে পরিপক্ক সয়াবিন ভালরূপে ভাজিয়া খোসা ছাড়াইয়া ফেলিতে হয় এবং যাঁতায় পিষিয়া আটা প্রস্তুত করা যায়। এই আটা হইতে সয়াবিনের রুটি, পাঁউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সয়াবিনের দুধ—প্রথমে পরিপক্ক শুক্‌না সয়াবিন খুব মসৃণ করিয়া গুঁড়া করিয়া পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে সেই গুঁড়ার সহিত তাহার আটগুণ জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। কিছুক্ষণ জ্বাল দিবার পরে দেখা যাইবে, সেই জল দুধের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাকেই সয়াবিনের দুধ বলা হয়। এই দুধ সামান্য তিক্ত হইলেও যথেষ্ট পুষ্টিকর। ইহার সঙ্গে রুচিমত কমবেশী কিছু চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয়।

ইহা ছাড়া আরও এক প্রকারে সয়াবিনের দুগ্ধ প্রস্তুত করা যায়। সয়াবিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়; জল দুই তিন বার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে ভাল হয়। পরে সেই সয়াবিন একটি শিলে ভালভাবে পিষিয়া লইলে দেখা যায়, উহা ময়দার আঠার ন্যায় মসৃণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই দ্রব্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশাইলে তাহা সয়াবিন-দুগ্ধে পরিণত হয়। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ইহা মিহি কাপড়ে ছাঁকিয়া গরম করিয়া লইতে হইবে। এই উপায়ে তৈয়ারী দুগ্ধে আদৌ তিক্ততা থাকে না এবং খাইতেও হয় অনেকটা সুস্বাদু।

বাংলাদেশের জনসাধারণের পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে দুধই সর্ব্বপ্রধান; অথচ দুধেরই অভাব খুব বেশী। পুষ্টির দিক দিয়া দুধের পরিবর্ত্তে শুধু সয়াবিন এবং সয়াবিন-জাত দ্রব্যাদিই দুধের অভাব মিটাইতে পারে। প্রতি ৬ সের সয়াবিন হইতে যে দুগ্ধ প্রস্তুত হয় তাহার সহিত যদি ২ ছটাক ক্যাল্‌সিয়াম্‌ কার্ব্বনেট এবং ১ ছটাক সোডিয়াম্‌ ক্লোরাইড্‌ (নুন) মিশাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সেই সয়াবিন-দুগ্ধ শিশুর পক্ষে গো-দুগ্ধের সমগুণসম্পন্নই হইবে। সেই দিক দিয়া বিচার করিলেও বাংলা দেশে সয়া-চাষের প্রচলন একান্ত প্রয়োজন। খাদ্য-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ যে আহার্য্য দৈনিক খাইতে অভ্যস্ত তাহা মোটেই তাহাদের শরীরের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তবে চাউলের সহিত যদি শতকরা ২০ ভাগ সয়াবিন জাতীয়

খাদ্য বাঙ্গালী গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই খাদ্য শরীর রক্ষার প্রায় সকল উপকরণবিশিষ্ট উপযুক্ত আহার্য্য হইবে।

বর্ত্তমানে কি করিয়া পুষ্টিকর খাদ্যের চাষ বৃদ্ধি করা যায় তাহার প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের চারিদিকে চলিতেছে। এই সুযোগে বাংলার চাষী যদি সয়াবিনের চাষ করিতে থাকে, তাহা হইলে খাদ্যসমস্যাও কিছু পরিমাণে লাঘব হইবে; পরন্তু পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেক চাষীরই কর্ত্তব্য কিছু কিছু সয়াবিনের চাষ করা; অন্ততঃ তাহাদের নিজেদের সম্বৎসরের ব্যবহারোপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা। বাংলাদেশে বহু পতিত জমি আছে, যে জমি ধান প্রভৃতি কোন ফসল চাষের উপযুক্ত নয়, কিন্তু সয়াচাষের উপযোগী। সেই সমস্ত জমিতে সয়ার আবাদ প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কথা হইতেছে, এত সয়াবিন চাষ করিয়া হইবে কি? সয়াবিনের চাহিদা কোথায়? বর্ত্তমানে তেমন কি আহার্য্য হিসাবে, কি নানা জাতীয় শিল্পে সয়াবিনের কোন ব্যবহারই ভারতবর্ষে নাই। সয়াবিনের প্রসার করিতে হইলে শিল্প এবং খাদ্য হিসাবে ইহার নানারূপ ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা খুবই সত্য যে, দৈনন্দিন খাদ্য হিসাবে মানুষ হঠাৎ কোন একটা নূতন জিনিষ গ্রহণ করিতে রাজী হয় না; কিন্তু একবার অভ্যস্ত হইতে পারিলে তাহা সহজে ত্যাগ করিতেও পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চায়ের প্রচলন দেখান যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের লোক চা খাইতে মোটেই অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলার

সুদূর পল্লীতেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে ইংল্যাণ্ডে আলুর প্রচলনেরও এই একই ইতিহাস। চা, আলু প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই প্রসার সম্ভব হইয়াছে ; কারণ ইহার পশ্চাতে সুনিয়ন্ত্রিত প্রচার-কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। জার্ম্মানী, আমেরিকা ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে সয়াবিনের প্রচলন পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় তাহা সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও নানারূপ প্রচারকার্য্য দ্বারা সয়াবিনের দৈনন্দিন প্রচলনের প্রসারকল্পে জনমত গঠন করিতে হইবে। ইহা হইলে সয়াবিনের ব্যবহার যে দিন দিন বাড়িয়া চলিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এইরূপে সয়াবিনের চাষ ও ব্যবহার বাংলায় প্রবর্ত্তিত হইলে একটি পুষ্টিকর খাদ্য সহজলভ্য হইবে। শক্তিহীন ও শ্রমকাতর বাঙ্গালী শক্তিমান ও পরিশ্রমী হইবে, বিঘা প্রতি কৃষকের আয় যথেষ্ট বাড়িবে। গরু, মহিষ প্রভৃতির জন্যও পুষ্টিকর খাদ্য মিলিবে এবং বিনা খরচায় জমি উর্ব্বর হইবে।

ছানা—সয়াবিন-দুগ্ধের সহিত সামান্য লবণাক্ত জল, অতি অল্প ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ অথবা সামান্য ফিট্‌কিরির জল, কিম্বা যৎসামান্য ভিনিগার মিশ্রিত করিলে কয়েকঘণ্টা পরে দেখা যাইবে উহা জমাট বাঁধিয়া ছানার আকার ধারণ করিয়াছে। তখন ইহা হইতে অতিরিক্ত জল ছাঁকিয়া ফেলা হয় এবং পরে গরম করিয়া একটি থালা বা ঐ জাতীয় কোন চেপ্‌টা পাত্রে দুই তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালিয়া ফেলিতে হয়। পরে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া উহার উপরে একটি ভারি জিনিষ

চাপা দিয়া রাখিতে হইবে, ইহাতে যে সামান্য জল সেই মণ্ডটির মধ্যে থাকে তাহাও বাহির হইয়া যাইবে। পরে ইহার সহিত চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া সন্দেশ জাতীয় নানা প্রকারের সুস্বাদু আহার্য্যও প্রস্তুত করা যায়।

সয়াবিনের বিস্কুট—একপোয়া সয়াবিনের ময়দা আধ-সের গমের ময়দা, দুইটা ডিমের কুসুম, দেড়পোয়া দুধ, এক ছটাক মাখম, এক ছটাক বেকিং পাউডার. সামান্য চিনি, একটু লবণ—এই অনুপাতে বিস্কুট তৈয়ারীর উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। পরে সয়াবিনের ময়দা, গমের ময়দা, বেকিং পাউডার, লবণ ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া সাধারণতঃ যেমন বিস্কুট প্রস্তুত হয় তেমনি ভাবে উপাদেয় বিস্কুট প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। সয়াবিনের তৈরী 'সুপুষ্টি বিস্কুট' বাজারে এখন কিছু কিছু পাওয়া যায়।

প্রশ্ন

১। আমাদের দেশে কত প্রকার ডা'ল আছে?

২। কলাই, মটর, মুগ, খেসারী, অড়হর, ছোলা, মসুর ইত্যাদি ডা'লের আকার, বর্ণ ও গুণ বর্ণনা করিয়া পার্থক্য বুঝাও।

৩। বিশেষ ডা'ল 'সয়ারিন' সম্বন্ধে কি কি জান?

৪। সয়াবিন হইতে কি কি খাদ্য তৈরী করা যায়?

ছোলা

সাধারণ বিবরণ—ছোলা ভারতবর্ষে বহুকাল হইতেই চাষ হইয়া আসিতেছে। পুরাণাদিতে ছোলার অনেক উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে প্রায় ৩ কোটী ৬০ লক্ষ বিঘা জমিতে ছোলার চাষ হইয়া থাকে। আগ্রা জেলায় অধিক পরিমাণে ছোলা উৎপন্ন হয়। অযোধ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মধ্যভারত, মহীশূর, বেরার, মাদ্রাজ, গোয়ালিয়র ও বঙ্গদেশ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বহু স্থানে ছোলার চাষ হইয়া থাকে।

জাতি—ছোলা প্রধানতঃ তিন জাতীয় দেখা যায়; যথা—দেশী, কাবুলী ও পাটনাই ছোলা। দেশী ছোলা আকারে ছোট, কাবুলী ও পাটনাই ছোলা আকৃতিতে বড়।

বীজের পরিমাণ—ছোলার বীজ বিঘায় সাধারণতঃ দশ সের আবশ্যক করে। জমির উর্ব্বরতা বুঝিয়া কাবুলী ছোলা আরও দুই সের হইলে ভাল হয়।

বপন সময়—ছোলা কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে বুনিতে হয়। যদি আশ্বিন মাস হইতে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায় তবে জমির রস থাকিতে থাকিতে আশ্বিন মাসেই ইহা বপন করা ভাল।

জমি ও চাষ—ছোলার জমি এঁটেল ও বালি-পড়া-নদীর চড়া, অথবা দোআঁশ হওয়া আবশ্যক। ছোলা বুনিবার সময় মাটিতে বেশ রস থাকা চাই; নতুবা বীজগুলি অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে বাধা জন্মে। ছোলায় সেচ দিবার আবশ্যক নাই,

তবে ক্ষেত্রের মাটি আল্‌গা না করিতে পারিলে রাত্রিকালীন শিশির মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না ; ইহাতে গাছ ভাল বাড়ে না। ছোলার জমিতে মটরের ন্যায় চাষ ও সার দিতে হয়। ইহার চাষের বিবরণ পৃথকভাবে দেওয়ার আবশ্যক করে না। যে জমিতে চূণের ভাগ বেশী আছে তাহাতে ছোলা ভাল জন্মে। বুনিবার পর অধিক বৃষ্টি হইলে, কিংবা শুঁটি ধরিবার সময় বৃষ্টিপাত হইলে ছোলা নষ্ট হইয়া যায়। গাছগুলি একটু বড় হইলে উহার ডগা কাটিয়া দিলে, কিংবা ভেড়া ছাগল ছাড়িয়া গাছ খাওয়াইয়া দিলে, অথবা গাছের মাথা কাটিয়া দিলে ডালপালা ছড়ায় ও ফসল বেশী হয়।

পাকিবার সময়—ছোলা ফাল্গুন হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে পাকিয়া থাকে। কেহ কেহ শুঁটি-সমেত ছোলার গাছ উপড়াইয়া বিক্রয় করে। কাঁচা ছোলা খাইতে সুমিষ্ট ও ইহা পোড়াইয়া খাইলে আরও মিষ্ট হয়।

খাদ্য হিসাবে গজানো ছোলা ও গজানো মুগ যে কত অধিক পুষ্টিদান করিতে পারে তাহা ভারতীয় গবেষণাগার হইতে ডাঃ বি, মুখার্জ্জী ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করিয়াছেন। আজ স্বাধীন ভারতের খাদ্য-তালিকায় ইহার স্থান খুব উচ্চে। ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাইরেক্টার ডাঃ আর, এন, চৌধুরী ছোলার ছাতু শিশুর পুষ্টিকর খাদ্য-তালিকায় সন্নিবেশ করিয়া অপ্রত্যাশিত ফল দেখাইয়াছেন।

মসূর

সাধারণ বিবরণ—মসূর ডা'ল ভারতবর্ষের অনেক স্থানে চাষ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ মধ্যভারত ও মাদ্রাজে ইহার অধিক চাষ হয়। পাঞ্জাবে ২৫০০ একর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১৬০,০০ একর ভূমিতে মসূর চাষ হইয়া থাকে। মধ্যভারতে নর্ম্মদা-নদীর উপত্যকায়, সাতপুরা এবং ছত্রিশগড় জেলায় ভাল মসূর জন্মে। বঙ্গদেশের মধ্যে পাবনা জেলায় বড় বড় দানাযুক্ত মসূর উৎপন্ন হয় এবং এই কলাইকে 'পাটনাই মসূর' বলে। বাঙ্গলার প্রায় সকল জেলাতেই মসূর উৎপন্ন হয়। বাঙ্গলার মসূর আকারে ছোট এবং পাটনাই মসূর অপেক্ষা ফলনে কম হয়। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলায় চাষীরা খেসারী কলাইয়ের মত জমিতে মসূর ছিটাইয়া দেয়। এইসব অঞ্চলে মাটি সাধারণতঃ সরস ও বেলে বলিয়া চাষ দিবার কোন আবশ্যক করে না। মসূর কলাইয়ের জমি একটু নিম্ন ও তেজস্কর হওয়া আবশ্যক। অনুর্ব্বর জমিতে মসূর ভাল জন্মে না।

চাষ ও বীজের পরিমাণ—কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত মসূর বপন করিবার সময়; তবে যত শীঘ্র বুনিতে পারা যায় ততই ফসল ভাল হয়। এক বিঘা জমিতে ৫।৬ সের বীজ লাগে। ভাদ্র কিংবা আশ্বিন মাসে জমিতে ৪।৫টী চাষ ও মই দিয়া মাটি বেশ গুঁড়া করিয়া গভীরভাবে চাষ দিতে হয়। মসূর কলাইয়ের জমি একটু সরস না হইলে গাছ ভাল হয় না।

জমির মাটি তৈয়ারী হইলে উহাতে বীজ বপন করিয়া পুনরায় একটি চাষ ও মই দিতে হয়। এক বিঘা জমিতে ৫।৬ মণ মসূর উৎপন্ন হয়। যদি উহাতে একটি সেচ দেওয়া হয়, তবে উৎপন্ন ফসল আরও এক মণ বেশী হয়। জমি আর্দ্র হইলে প্রথমে গাছ বেশ ভাল হয়; কিন্তু শেষে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না. গাছগুলি ধূসর বর্ণে পরিণত হয়। মসূর ও ছোলা চাষ করিলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়; কারণ এই গাছগুলি বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া শিকড়ের মাধ্যমে জমিতে প্রবেশ করাইয়া দেয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কোষ্ঠবদ্ধ রোগে মসূর বড় উপকারী। মসূরের ঝোল বার্লির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে খাওয়াইলে উপকার করে ও শীঘ্র বল বৃদ্ধি হয়।

"লেন্‌টিল ফুড" (Lantil food) জার্ম্মান জাতির একটি প্রিয় ও বহুল-ব্যবহৃত রোগীর পথ্য (Invalid food)। প্রকৃত-পক্ষে ইহা মসূরের নির্য্যাস। মসূরীর যূষ (Essence of Mossurie) রোগীর পথ্য হিসাবে স্বাধীন ভারতে চালু করা প্রয়োজন। মসুর ডালে শতকরা ২৫ ভাগ প্রোটিন আছে। এই হিসাবে চীনা বাদামের পরই মসূরের স্থান।

মুগ

সাধারণ বিবরণ—কলাইয়ের মধ্যে মুগ কলাই-ই প্রধান। মুগ কলাই প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কৃষ্ণমুগ ও

সোনামুগ। কৃষ্ণমুগ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও আকারে সোনামুগ অপেক্ষা বড়। সোনামুগ আবার প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা, সোনামুগ, ঘোড়ামুগ ও ঘেঁসোমুগ। সোনামুগের ডাউল অতি উৎকৃষ্ট। ডাউলের মধ্যে সোনামুগ আভিজাত। ঘোড়ামুগ ও ঘেঁসোমুগ দেখিতে অনেকটা সোনামুগের ন্যায় ; কিন্তু আকৃতিতে সোনামুগ অপেক্ষা একটু লম্বা ও ঈষৎ সবুজ বর্ণের। সোনামুগ আকৃতিতে ছোট ও দেখিতে পীতবর্ণ এবং স্বাদে ও গুণে ডা'লের সেরা।

বপনের সময়—মুগের জমিতে ৩।৪টি চাষ ও মই দিয়া মাটি বেশ গুঁড়া ও তৃণহীন করা কর্ত্তব্য। মুগ কলাইয়ের জমি উর্ব্বরা না হইলে মুগ ভাল হয় না। জমিতে যদি তেজ না থাকে তবে বিঘা প্রতি ২০ মণ গোবর সার দিয়া মুগ বুনিলে ফসল বেশ ভাল হয়। মুগ উৎপন্ন হইবার পর উক্ত সার জমিতে থাকিয়া যায়। ইহাতে অপর ফসলের ফলনও বেশ ভাল হয়। বিঘাপ্রতি মোটামুটি ৫ সের কৃষ্ণমুগ ও ৪ সের সোনামুগের বীজ বপন করা আবশ্যক হয়।

ফলন—এক বিঘা জমিতে ২।৩ মণ সোনামুগ ও ৪ মণ কৃষ্ণমুগ উৎপন্ন হইতে পারে। যে বৎসর বেশ বৃষ্টি হয়, সে বৎসর ইহার অধিক ফলন হয়। ভাল বৃষ্টি না হইলে মুগের ফলন কম হয়। সরকারের নূতন পরিকল্পনায় চাষের জমিতে নলকূপ খননের ফলে সেচের জল পাইয়া অপ্রত্যাশিত ফসল ফলিতেছে।

খেঁসারী

সাধারণ বিবরণ—খেঁসারী কলাই সাধারণতঃ আমন ধানের জমিতে ছিটাইয়া চাষ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে জমিতে কাদা থাকিলে বিঘা প্রতি তিন সের পরিমাণ বীজ ধান্যক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহা ব্যতীত খেঁসারী চাষে আর অপর কিছু করিবার আবশ্যক করে না।

সার—খেঁসারীর জমিতে পৃথক্ সার দিবার আবশ্যক নাই। ধান্যের জমিতে যে সার দেওয়া হয় তাহাতেই খেঁসারীর ফলন বেশ ভাল হয়।

পরবর্ত্তী চাষ ও পাকিবার সময়—ধান্যগুলি যখন পৌষ মাসে কাটা হয়, তখন খেঁসারী গাছ ছোট থাকে। ধান কাটিবার সময় কতকগুলি গাছের মাথা কাটা যায় ও কতকগুলি অক্ষত অবস্থায় থাকে। ক্ষেত্র হইতে ধান কাটা হইলে খেঁসারীর সেই গাছগুলি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ গাছগুলি গরুকে খাওয়াইয়া দেয়। চৈত্র মাসে খেঁসারী কলাই পাকিয়া থাকে। পাকিলে গাছগুলি উপড়াইয়া আনিয়া গরুর সাহায্যে মাড়াই করিলে খেঁসারী কলাই পাওয়া যায়। যে ধান্যের ক্ষেত্রে অধিক রস থাকে, তথায় খেঁসারী বেশী উৎপন্ন হয়।

খেঁসারী ও পক্ষাঘাত—খেঁসারীর ডাউল খাইলে পক্ষাঘাত রোগ হয় বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু প্রফেসর ডানষ্টান বিলাতের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে ভাল

করিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, খেঁসারীতে পক্ষাঘাত রোগের কোন বিষ নাই। এরূপ প্রবাদ ভ্রমাত্মক ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে ইহা দামে সস্তা ও তেমন পুষ্টিকর নহে বলিয়া খাদ্য হিসাবে অনেকের নিকটই খেঁসারীর আদর কম।

অড়হর

সাধারণ বিবরণ—কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে অড়হর গাছের বর্ণনা দেখা যায়। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, অতি প্রাচীন কালেও আমাদের দেশে ইহার চাষ হইত। সাম্প্রতিক কালে ১৬৮৬ অব্দে মালাবার উপকূলখণ্ডে ইহার প্রথম চাষ হয়। মলিসন্ সাহেব বলেন যে, বোম্বাই প্রদেশে সাদা ও লাল দুই প্রকার অড়হর উৎপন্ন হয়। উভয়বিধ অড়হর একসঙ্গে বপন করিতে পারিলে পর বৎসরের জন্য বেশ ভাল বীজ পাওয়া যাইতে পারে।

উৎপত্তি স্থান—অড়হর বোম্বে, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মহীশূর, বেরার, রাজপুতনা, মধ্যভারত, বঙ্গদেশ ও আসাম অঞ্চলে চাষ হইয়া থাকে।

চাষ প্রণালী—মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে অড়হরের জমিতে ৪।৫টি চাষ দিয়া মাটি আল্‌গা ও তৃণহীন করিয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে বৃষ্টি হইলে বিঘা প্রতি ৫ সের হিসাবে বীজ ক্ষেত্রে বুনিয়া একটি চাষ ও মই দিতে হয়। লাঙ্গলের

ফালির মধ্যে ২ হাত অন্তর বীজ ফেলিয়া গেলে বিঘা প্রতি ⁄১৷৹ সের বীজ লাগে এবং গাছ পাতলা জন্মিলেও ফল ভাল হয়। দুই হাত অন্তর আইল তুলিয়া আইলের উপর ২ হাত অন্তর বীজ বুনিলে গাছ খুবই ভাল হয়। সমতল জমি অপেক্ষা উঁচু আইলের উপর অড়হরের গাছ ভাল হয়।

গাছগুলি বাহির হইলে একবার নিড়ান দিতে পারিলে ভাল হয়, নতুবা নিড়ান না করিলেও তেমন কোন ক্ষতি হয় না। বর্ষায় অড়হরের জমি হইতে জল নিকাশ করা উচিত, নতুবা চারাগুলি মরিয়া যায়। অড়হরের সহিত ভুট্টা এক সঙ্গে বপন করা চলে এবং মিশ্রিত ফসলের চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি তিন সের বীজ আবশ্যক হয়। ভুট্টাগুলি পাকিয়া গেলে অড়হর গাছগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসে কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে যে অড়হর বোনা হয়, তাহাকে মাঘী অড়হর ও আষাঢ় মাসে যে অড়হর বোনা হয় তাহাকে চৈতালী অড়হর কহে। শেষোক্ত অড়হর মাদ্রাজ প্রদেশেই সচরাচর চাষ হইয়া থাকে। অড়হর কলাই বঙ্গদেশে মাঘ মাসের ১৫ই হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে পাকিয়া থাকে। জমির অবস্থা অনুসারে বঙ্গদেশে বিঘা প্রতি ৫ মণ হইতে দশ মণ অড়হর ফলিয়া থাকে। পাটনাই অড়হর দেশী অড়হর অপেক্ষা বড় হয়। অড়হর পাকিয়া গেলে পরিপক্ক দানার ডালগুলি বাছিয়া বাছিয়া কাটিতে হয়। এক গাছের সমস্ত ফল একসঙ্গে পাকে না। ডালগুলি কাটিবার সময় গাছের যে স্থান হইতে প্রশাখা বাহির হইয়াছে সেই স্থান

হইতে কাটিলে পর বৎসর ঐ গাছে আবার ফসল পাওয়া যায়। এইরূপে পর পর সাধারণতঃ তিন বৎসর একই গাছে ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

পোকা—অড়হর গাছে এক প্রকার পোকা ধরিয়া সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া দেয়। যখন গাছগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় তখন প্রজাপতিরা উহার গাত্রে ডিম পাড়ে; সেই ডিম হইতে যে পোকা হয় তাহা গাছের ভিতর প্রবেশ করিয়া গাছের রস খায়। যখন গাছগুলি ফলিতে আরম্ভ হয় তখন সেই পোকাগুলি শুঁটির ভিতর প্রবেশ করিয়া উহা নষ্ট করিয়া দেয়। এই পোকা নিবারণের দুইটি মাত্র উপায় আছে। যে জমিতে পোকা ধরিয়াছে সেই জমি একবার অড়হর চাষের পর পতিত রাখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, অড়হর চাষের সহিত ভূট্টা চাষ করিলে অড়হর গাছে পোকা ধরিবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

অড়হর গাছে গালা—উত্তরবঙ্গে ও আসামে গালা চাষের জন্য অড়হরের চাষ হয়। তথাকার চাষীরা গালার পোকাগুলি অড়হর গাছে ছাড়িয়া দেয়। পোকাগুলি ক্রমে বংশ বিস্তার করিয়া সমগ্র অড়হর গাছে গালা উৎপাদন করে। আসামের গ্যারো জাতিরা বলে, অপর গাছে গালার চাষ করা অপেক্ষা অড়হর গাছে চাষ করা ভাল। যদি অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বোনা যায় ও ভাল করিয়া জল দেওয়া হয়, তবে আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে চারাগুলি ফুলে-ফলে শোভিত হয়। চারাগুলি ৪ ফুট অন্তর সারিতে ও ৮ ফুট তফাতে বসাইতে হয়। এক বিঘা

জমিতে ৪৬০টি চারা হইতে পারে এবং দুই বৎসর ধরিয়া উক্ত জমিতে গালার চাষ হইতে পারে।

বরবটি

সাধারণ বিবরণ—বরবটি কলাই নানাজাতীয় আছে। এক প্রকার বরবটি বাগানে চাষ হয়, ইহার গাছ লতা জাতীয়। ইহার শুঁটি আকারে লম্বা এবং বাজারে তরকারীর জন্য বিক্রীত হইয়া থাকে। আর এক প্রকার বরবটি আছে উহা ক্ষেত্রে চাষ হয়। ইহার কাঁচা শুঁটির তরকারী বেশ ভাল হয় এবং ইহার ডাউল মুগের ডাউলের ন্যায় রাঁধিয়া খাওয়া যায়। বরবটির বড়ি বেশ সুস্বাদু ও মিষ্ট।

চাষ ও বসাইবার সময়—বাগানে যে বরবটি কলায়ের চাষ হয়, তাহার অপর নাম 'রম্ভা কলাই'। এই কলাই ফাল্গুন অথবা চৈত্র মাসে বসাইতে হয়। যে কলাই জমিতে চায হয় উহা আশ্বিন অথবা কার্ত্তিক মাসে বুনিয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে ৫ সের বীজের আবশ্যক হয়। বরবটি কলাইয়ের জমি একটু উর্ব্বরা হওয়া আবশ্যক, নতুবা গাছ তেমন ভাল হয় না, ফসলও কম হয়। গাছগুলি উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বুনিলে উহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গাছে অধিক পরিমাণে শুঁটি ধরিয়া থাকে।

পাকিবার সময়—পৌষ মাসে বরবটি পাকিয়া থাকে। কলাই পাকিলে উহা মুগ অথবা মাষ কলাইয়ের ন্যায় উপড়াইয়া

রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। বেশ শুষ্ক হইলে গরুর দ্বারা মাড়াই করিয়া, অথবা লাঠির ঘা মারিয়া শুঁটি হইতে কলাই বাহির করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে সাধারণতঃ ৩।৪ মণ বরবটি কলাই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উৎপত্তি স্থান—বরবটি উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, বিহার, গুজরাট ও বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি স্থানে জন্মিয়া থাকে। বরবটি কলাই যে জমিতে চাষ করা হয়, তাহার মাটি মোটামুটি উর্ব্বরা হওয়া আবশ্যক। বরবটির ডাউল ও বড়ি যেমন মুখরোচক ও মিষ্ট, তেমনি উহার গাছ গরুর পক্ষে বড়ই মুখরোচক ও খাইলে গরু মোটা ও বলবান হয়।

মাষকলাই

সাধারণ বিবরণ—মাষকলাই ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই চাষ হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে মাষকলাই উৎপন্ন হইতে পারে।

চাষ ও বপনের সময়—বঙ্গদেশে আউস ধান কাটা হইলে সেই জমিতে দুইবার চাষ ও মই দিয়া মাষ কলাইয়ের বীজ বুনিয়া দেওয়া হয় ও আর একটি চাষ ও মই দিয়া বপন কার্য্য শেষ করা হয়। খনার মতে ভাদ্র মাসের কুড়ি তারিখের পর হইতে আশ্বিন মাসের উনিশ তারিখ পর্য্যন্ত কলাই বুনিবার প্রকৃষ্ট সময়। খনার বচনটি হইল এই ঃ

ভাদ্রের কুড়ি,
আশ্বিনের উনিশ,
যত পারিস্ কলাই বুনিস্।

বীজের পরিমাণ ও উৎপন্ন ফসল—এক বিঘা জমিতে মাষ কলাই বুনিতে ৫ সের বীজের আবশ্যক হয়। আর বিঘা প্রতি গড়ে ২।৩ মণ মাষকলাই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শিমূল বা কাসাভা আলু

সাধারণ বিবরণ—শিমূল আলুর আদি জন্মস্থান আমেরিকা। ইহা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টুগীজদিগের দ্বারা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে এদেশে আনীত হয়। এক্ষণে ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে গোয়া পর্য্যন্ত ভূ-ভাগে, ত্রিবাঙ্কুর ও পণ্ডিচেরীতে প্রচুর 'শিমূল আলু' জন্মিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময় অনেক স্থানে ইহা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

চাষ—কাসাভা চাষে জলের বেশী আবশ্যক হয় না। অল্প জলেই গাছ বেশ জন্মে। বাগানের বেড়ার মধ্যে ইহার বেশ চাষ হয়। ইহার চাষ করিতে হইলে ডাঁটাগুলি ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা করিয়া কাটিতে হয় এবং অর্দ্ধেক অংশ মাটিতে একটু হেলাইয়া ৪ ফুট অন্তর বসাইতে হয়। জমিতে চাষ করিতে হইলে ক্ষেত্রে ৪।৫টী চাষ ও মই দিয়া মাটি আলগা ও গুঁড়া করিয়া উভয় দিকে ৪।৫ ফুট অন্তর বসাইয়া দেওয়া বিধেয়। যদি ক্ষেত্রের মাটি

তৈয়ারী করিতে দেরী হয়, তবে গাছের ডালগুলি ৭।৮ ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া কোন একটু শীতল স্থানের মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতে হয়। মধ্যে মধ্যে জল দিলে গাছগুলি হইতে শিকড় বাহির হয় ও গাছ গজাইতে আরম্ভ হয়। যখন ক্ষেত্র তৈয়ারী হইবে তখন ঐ গজানো ডালগুলি উপরোক্ত হিসাবমত জমিতে পুঁতিয়া দিতে হইবে। যে ডগাটী কাটিয়া বসাইতে হইবে উহা যেন বেশী পুরাতন বা ডালের একেবারে নরম ডগা না হয়। একটী গাছ হইতে প্রায় ১০০টী ডগা পাওয়া যায়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই কাসাভা বসাইবার সময়। কাসাভা অবশ্য বৎসরের সকল সময়েই বসান যাইতে পারে। সচরাচর শীতের শেষে বসালেই ভাল হয়। যে সকল ক্ষেত্রে ধান, গম প্রভৃতি ফসল ভাল হয় না, অথচ কলাই ও ছোলা বেশ জন্মে, সেই জমিতে কাসাভা গাছ ভাল জন্মে। গাছগুলি বেশ গজাইয়া উঠিলে মাটি আল্‌গা করিয়া ঘাস নিড়াইয়া দিতে হয়। কাসাভাকে মেদিনীপুরে শিমূল আলু বা 'সরকন্দ' বলে। ইহা মুক্ত বাগানের ধারে ও খোলা জমিতে ভাল জন্মে। ইহার টাট্‌কা মূল হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। বঙ্গদেশের উচ্চ জমিতে ইহার চাষ করিলে ফসল বেশ ভাল হয়। গাছগুলি ৪ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং তাহার মূল বার মাসের মধ্যেই ৪।৫ সের হইতে অনেক সময় অর্দ্ধমণ পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে।

উৎপত্তি স্থান — ভারতবর্ষের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, বঙ্গদেশের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় ও আসামে কাসাভার

চাষ হইয়া থাকে। কাসাভা চাষে প্রত্যেক বৎসর মূল তুলিবার আবশ্যক নাই। যে বৎসর অন্যান্য ফসল ভাল না হয় ও খাদ্যাভাব ঘটে সেই বৎসর ইহার মূল তুলিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা জমিতে রাখিয়া দিলেও কোন ক্ষতি নাই, বরং ইহার মূল আরও বাড়িয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময় ইহার মূল মানুষের খাদ্য যোগায় ও পাতাগুলি গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মিষ্ট শিমূল আলুর পাতা অবিকল শিমূল গাছের পাতার ন্যায়। কাসাভা চাষ করিতে হইলে যে গাছগুলির মূল মিষ্ট সেই জাতীয় গাছ হইতে ডাল লওয়া উচিত। কোন কোনগুলির মূল তিক্ত ও বিষাক্ত; ইহাদের মূলগুলি সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত করিলে বিষাক্ত অংশ নস্ট হইয়া যায়।

কাসাভার ময়দা প্রস্তুতি—মূলগুলি প্রথমে মাটি হইতে তুলিয়া উহা জলে ফেলিয়া মাটি ও শিকড়গুলি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। মূলগুলি বেশ পরিষ্কার হইলে উহা এক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখার পর জল হইতে তুলিয়া প্রত্যেক মূল ছুরির দ্বারা চাঁচিয়া সেগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হয়। সেই কর্ত্তিত খণ্ডগুলি পরিস্কৃত জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া ঢেঁকিতে দিয়া কুটিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা মণ্ড প্রস্তুত হইলে তাহা এক খণ্ড বস্ত্রে বাঁধিয়া ময়রাদের ছানা ঝাঁক দেওয়ার ন্যায় উহার উপর কোন ভারী জিনিষ চাপাইয়া দিলে:তিক্ত ও বিষাক্ত অংশ বাহির হইয়া যাইবে। এক্ষণে উক্ত মণ্ডগুলি একখণ্ড বস্ত্রে বাঁধিয়া পরিস্কৃত জলের গামলায় ফেলিয়া নাড়িতে হয়। ইহাতে

দুগ্ধের ন্যায় পদার্থ গামলার জলের সহিত সঞ্চিত হয় এবং সেই জল স্থির হইলে আস্তে আস্তে উপরের জল ফেলিয়া দিলে তলায় ময়দার ন্যায় অংশ জমিয়া থাকে। সেইগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিলে কাসাভার ময়দা প্রস্তুত হইল। যদি কাসাভার গুঁড়া-গুলিকে দানা বাঁধাইবার আবশ্যক হয় এবং উহা হইতে কাসাভা সাগু প্রস্তুত করিতে হয়, তবে গুঁড়াগুলিকে একেবারে শুষ্ক না করিয়া কিছু আর্দ্র রাখিতে হয়। একটী পিতলের কিংবা এলুমিনিয়মের কড়াই অল্প অগ্নির উত্তাপে চাপাইয়া সেই আর্দ্র গুঁড়াগুলি তাহাতে ফেলিয়া দিয়া খুন্তি দ্বারা ঘন ঘন নাড়িলে উহাতে দানা বাঁধিয়া কাসাভার দানা বা সাগু প্রস্তুত হয়।

শিবপুর ফার্ম্মে ৯টি কাসাভা গাছ হইতে ২২০ পাউণ্ড মূল ও ১৪৯॥ পাউণ্ড আর্দ্র মণ্ড এবং ৩৩ৢ পাউণ্ড কাসাভা-গুঁড়া, অর্থাৎ ৪৫ পাউণ্ড শুষ্ক কাসাভা খাদ্য পাওয়া গিয়াছিল।

বিঘা প্রতি ফলন—এক বিঘা জমিতে কাসাভা চাষ করিতে হইলে ৬০০ শত কাসাভার ডগা (কর্ত্তিত) রোপন করা যায় এবং বিঘায় ১৫০ মণ কাসাভা মূল উৎপন্ন হয়। এই মূল হইতে মোটামুটি ২০০ টাকার কাসাভা খাদ্য পাওয়া যায়।

কাসাভার ময়দা হইতে রুটী, পুরী, মাল্‌পো, হালুয়া ও উৎকৃষ্ট বিস্কুট প্রস্তুত হয়। কাসাভার মাল্‌পো খাইতে অতি সুস্বাদু ও মুখরোচক। কাসাভার হালুয়া প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে জলে চিনি দিয়া ফুটাইতে হয়। তৎপরে কাসাভার গুঁড়া জলে গুলিয়া চিনির জলে মিশ্রিত করিয়া কিছু ঘৃত ও

কিস্‌মিস্‌ দিলে বেশ হালুয়া প্রস্তুত হয়। কাসাভার বিস্কুট প্রস্তুত করিতে হইলে তিন ভাগ কাসাভা গুঁড়া ও ১ ভাগ ময়দা মিশ্রিত করিয়া লইলে ভাল হয়।

গাছের পরিচয়—কাসাভার গাছ রেড়ি গাছের ন্যায় লম্বা। পাতাগুলি দেখিতে শিমূল গাছের পাতার মত। পাতার উপরিভাগ গাঢ় সবুজ ও নিম্নভাগ ফিকে সবুজ বর্ণ। একই ডাঁটায় পুং-পুষ্প ও স্ত্রী-পুষ্প জন্মিয়া থাকে। স্ত্রী-পুষ্প আকারে ছোট এবং পুং-পুষ্প স্ত্রী-পুষ্পের উপরিভাগে জন্মে। ফুলগুলির বহির্ভাগ গাঢ় লালবর্ণের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ। কাসাভার বীজগুলি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। গাছের মূল দেখিতে লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ; কোন কোনটি বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের আভাযুক্ত। মূলের ভিতরটি শ্বেতবর্ণ, কখনও বা পীতবর্ণ।

ষষ্ঠ পাঠ

তৈল-বীজ শস্য

তিল, সরিষা, রাই-সরিষা, চিনাবাদাম, রেড়ি, টাংরয়না, সোরগোজা, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি তৈল উৎপাদক ফসল।

আমাদের বাংলাদেশে যে সমস্ত কৃষিজমি আছে তন্মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে আমরা তৃণ-জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিয়া থাকি। শতকরা যে ৪০ ভাগ জমি বাকী রহিল, উহার

বেশীর ভাগ জমিতেই আমরা ডা'ল প্রভৃতি অপরাপর খাদ্যশস্যকে অবহেলা করিয়া বিভিন্ন তৈলপ্রদ শস্য বপন করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, এইসব শস্য যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় উহার বেশীর ভাগই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং উহা হইতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই সব তৈল-বীজ রপ্তানি না করিয়া আমরা যদি উহা হইতে উৎপন্ন তৈল রপ্তানি করি তাহা হইলে উহার খৈল আমরা নিজেদের কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারি। তৈলবীজের খৈলের সার অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে এবং গবাদি পশুগুলিও ঐ খৈল খাইয়া নিজেদের দেহ পুষ্ট করিয়া আমাদের আরও অনেক বেশী উপকার সাধন করিতে পারে।

আমাদের দেশ হইতে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকার রেড়ির তৈল, ২০ লক্ষ টাকার নারিকেল তৈল এবং প্রায় ২০ কোটী টাকার অন্যান্য তৈলপ্রদ বীজ বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

জমি—একমাত্র তিসি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার তৈলবীজের চাষেই উর্ব্বর জমির বিশেষ আবশ্যক করে না। প্রস্তরময় এবং বালুকাময় জমিতে সর্ষপ, তিল, রেড়ি, সোরগোজা প্রভৃতি খুব ভাল জন্মিয়া থাকে। ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থান এই সমস্ত শস্য জন্মিবার অনুকূল। প্রত্যেক জিলার চর জমিতে এবং নদীর তীরে রাই-সরিষা, তিসি, রেড়ি, চিনাবাদাম প্রভৃতি উত্তমরূপে জন্মিতে পারে। উৎকৃষ্ট চিনাবাদাম, তিসি ও নারিকেল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর, কটক এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে হিজলী-বাদামের গাছ জন্মিয়া থাকে। এই বাদাম হইতে শতকরা ৪০ ভাগ অতি সুমিষ্ট তৈল বাহির হয়। বালুকাময় এবং প্রস্তরময় জমিতে এই গাছ জন্মে। বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন নদীতীরবর্তী বালুকাময় চরেও ইহা জন্মিতে পারে।

আহারীয় ও অনাহারীয় খৈল—হিজলীবাদাম, চিনা-বাদাম, পোস্তদানা ও তিল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে যে খৈলভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা মানুষেরও আহারের উপযোগী। সর্ষপ, নারিকেল, তিসি, কুসুমবীজ, সোরগোজা প্রভৃতি কয়েকটি তৈলপ্রদ বীজ হইতে যে খৈল পাওয়া যায় তাহা গবাদি পশুর খাদ্য। নিম্বের, রেড়ির ও মহুয়ার খৈল গরুর অখাদ্য ; কিন্তু রেড়ির খৈল সকল প্রকার খৈলের চেয়ে তেজস্কর।

তৈলের তারতম্য—সাঁওতালেরা নিম্বের তৈল গায়ে মাখে এবং মহুয়ার তৈল খাইয়া থাকে। মধ্যভারতের লোকেরা কুসুমবীজ ও সোরগোজার তৈল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। বাংলাদেশের লোকেরা সাধারণতঃ সর্ষপের তৈলই ব্যবহার করিয়া থাকে। খাঁটি সরিষার তৈল খাদ্য-তালিকায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ সরিসার তৈল ব্যবহারেই হৃদ্‌রোগ নিরাময় হইতে পারে। বিভিন্ন স্থানে তিলের তৈলের ব্যবহারও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; বঙ্গ রমণীরা নারিকেল তৈল মাথায় মাখিয়া থাকেন। মাদ্রাজে নারিকেল তৈল রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। অনেক অসাধু ব্যবসায়ী কোচড়ার তৈল ঘৃতের

সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে ; কারণ, উহা দেখিতে অনেকটা ঘৃতের ন্যায়।

বাতির তৈল—পূর্ব্বে সর্ষপ, নারিকেল এবং রেড়ির তৈল দ্বারা আলো জ্বালাইবার রীতি এদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ তৈল বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে পিত্তরাজ ও রয়না নামক গাছের বীজ হইতে এবং কটক অঞ্চলে করঞ্জা ও পুণাক নামক বৃক্ষের বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া আজকালও কোথাও কোথাও প্রদীপাদি জ্বালান হইয়া থাকে। সাঁওতালেরা অনেক স্থানে শিয়াল-কাঁটার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া আলো জ্বালাইয়া থাকে। এই সব নিম্নস্তরের সস্তা তৈল সরিষার তৈলে ভেজালরূপে ব্যবহার করা একটি গুরুতর অপরাধ এবং আইনত দণ্ডার্হ।

তিল

উচ্চ দোয়াঁশ জমিতেই তিলের চাষ ভাল হয়। তিল সাধারণতঃ তিন প্রকার—শ্বেত, কৃষ্ণ ও রাই। সকল প্রকার তিলেরই চাষের ব্যবস্থা মোটামুটি একরূপ।

তিলের চাষে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হয়। জমি ভালরূপ চাষ না হইলে ভাল ফসল হয় না। আষাঢ় হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত যে কোন সময় তিলের চাষ করা যায়। বিঘা প্রতি দেড় সের আন্দাজ বীজ বপন করিলেই চলে।

সকল প্রকার তিল সমান ফলে না। বিঘা প্রতি শ্বেততিল মোটামুটি চারি মণ, কৃষ্ণতিল পাঁচ মণ ও রাইতিল দুই মণ মাত্র ফলিয়া থাকে।

ভালরূপ চাষ হইলে তিলের চাষে জমিতে কোন প্রকার সারের আবশ্যক হয় না। ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং যতদিন না বীজ অঙ্কুরিত হয়, ততদিন সামান্য জল সেচন করা আবশ্যক ; কিন্তু চারাগুলি বাহির হইলে আর জলের আবশ্যক হয় না। ইহার পরে তিলের চাষে জলের আর দরকার নাই ; গাছের গোড়ায় জল থাকিলে গাছগুলি পচিয়া যায়।

পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তিল পাকে। শ্বেততিল ও কৃষ্ণতিল অপেক্ষা রাইতিল কিছু বিলম্বে ফলে। সব রকম তিলের তৈল নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সর্ষপ বা সরিষা

সাধারণ বিবরণ— ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বম্বে, মধ্যভারত ও বঙ্গদেশে প্রায় ১০ লক্ষ বিঘা জমিতে সরিষার চাষ হইয়া থাকে।

শ্রেণীবিভাগ—সর্ষপ সাধারণতঃ তিন জাতিতে বিভক্ত— রাই সর্ষপ, টোরি সর্ষপ ও শ্বেত সর্ষপ। উচ্চ মাঠান কিম্বা কর্দ্দমাক্ত দোআঁশ জমিতে সর্ষপের চাষ কিছু ভাল হয়। সারের মধ্যে পচা গোময় সারই প্রশস্ত।

যে সব জমিতে যব বা গমের চাষ হয়, সেই জমিই সর্ষপ চাষেরও উপযোগী। ভাদ্র কিংবা আশ্বিন মাসে সর্ষপের চাষ আরম্ভ হয় এবং ফাল্গুন কিম্বা চৈত্র মাসে ফসল পাকিয়া থাকে। তবে রাইসর্ষপগুলি কিছু আগে বুনিলেও চলিতে পারে।

ক্ষেত্র একবার মাত্র কর্ষণ করিয়া সার দিয়া বীজ ছড়াইতে হয়। বিঘা প্রতি অর্দ্ধ সের বীজ যথেষ্ট। প্রতি বিঘায় ফসল প্রায় দুই মণ হইয়া থাকে।

সর্ষপের চাষে বিলক্ষণ লাভ আছে, অথচ বিশেষ পরিশ্রমেরও আবশ্যক হয় না। সরিষার তৈল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় খাদ্য তালিকার উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে। হৃদ্‌রোগে খাঁটি সরিষার তৈল বিশেষ হিতকর। ইহার খাদ্যমূল্য ও দামের জন্য আজকাল ইহাতে ভেজাল খুব বেশী হইতেছে। এবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

তিসি বা মসিনা

সাধারণ বিবরণ—তিসি অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা, আইনী আক্‌বরী প্রভৃতি গ্রন্থে তিসির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে অনেকটা পাটের মত আঁশ প্রস্তুত করিবার জন্য তিসি গাছের চাষ হইত। কিন্তু ইহার আঁশ তাদৃশ ভাল না হওয়ায় এবং ইহার প্রস্তুতির খরচও বেশী পড়ে বলিয়া আজকাল আর কেহ তিসি গাছের আঁশ প্রস্তুত করে না। তিসির গাছ

হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। আজকাল কেবলমাত্র তৈলের জন্যই তিসি বহুল পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে।

জাতি—তিসি দুই জাতীয় আছে, যথা—শ্বেত ও ধূসরবর্ণ। শ্বেত তিসি হইতে অধিক পরিমাণে তৈল বাহির হয়। ভারতবর্ষের প্রায় ১০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিসির চাষ হয়, তাহার মধ্যে কেবল বঙ্গদেশ ও বিহারেই ৩ লক্ষ বিঘা। বিহারে চম্পারণ, দ্বারভাঙ্গা, গয়া, সারণ, মজঃফরপুর এবং পশ্চিম বঙ্গে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, পূর্ববঙ্গে নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, এবং মৈমনসিং জেলায় তিসির চাষ বেশী হইয়া থাকে। পূর্বে যে সকল জমিতে নীলের চাষ হইত সেই সকল জমিতে তিসির চাষও ভাল হইতে পারে। ফরিদপুর জেলায়ও অল্প বিস্তর তিসি বা মসিনার চাষ হইয়া থাকে।

চাষ—আশ্বিন মাসে তিসির জমি তৈয়ারী করিতে হয়। একটু গভীর চাষ তিসির পক্ষে উপযোগী।

ফলনের সময়—তিসি পৌষ কিংবা মাঘ মাসের প্রথমভাগে পাকিয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে ৩।৪ মণ তিসি উৎপন্ন হয়। তিসির গাছগুলি জ্বালানির জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। তিসির গাছ বা পাতা গরু, মহিষ বা অন্য কোন গৃহপালিত পশুকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে; কারণ ইহা বিষাক্ত। ইহাতে হাইড্রোসায়ানিক বা প্রুসিক এসিড নামক বিষ বিদ্যমান থাকে। লেখক কাঁচা তিসির গাছ হইতে ঐ বিষাক্ত প্রুসিক বা হাইড্রোসায়ানিক এসিড তির্য্যকপাতন দ্বারা নিষ্কাষণ

করিয়া হৃদ্‌রোগে প্রয়োগ করিয়া "হঠাৎ মৃত্যু" ব্যাধির চিকিৎসায় যথেষ্ট ফল পাইয়াছেন।

খৈল—তিসির খৈল গরুকে খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে এবং সেই দুগ্ধ হইতে অধিক মাখন পাওয়া যায়। তিসির খৈলের সার সরিষার খৈলের সার অপেক্ষা তেজস্কর। ইহার খৈল খাওয়াইলে গরু ও মহিষ যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।

তৈল—তিসি হইতে মণকরা ১০ সের তৈল বাহির হয়। ভারতবর্ষে তিসির তৈল নিষ্কাষণের প্রায় এক শতটি কল আছে। বঙ্গদেশে কলিকাতার নিকট গৌরীপুরে ও হাওড়ায় রামকৃষ্ণপুরে তিসির তৈলের কল আছে। এখান হইতে অল্প পরিমাণে তৈল অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

তিসির তৈল ছাপার কালী, বার্ণিশ ও নরম সাবান তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। জানালা, দরজা প্রভৃতি রঙ্ দিতে হইলে তিসির তৈলের সহিত রঙ্ মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার—তিসি বাঁটিয়া গরম করিয়া অনেক সময় ব্যথাবেদনায় রোগীকে পুল্‌টিস্ দেওয়া হয়। দেহের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে সেই স্থানে তিসির তৈল লাগাইলে পোড়ার যন্ত্রণা নিবারিত হয় ও ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়।

ভেরেণ্ডা বা রেড়ি

বাঙ্গালাদেশে রেড়ি বা ভেরেণ্ডার চাষ প্রচুর হইতে পারে। রেড়ির বীজ বুনিবার পূর্ব্বে তুঁতের জলে ভিজাইয়া বুনিলে

পোকায় উহা নষ্ট করিতে পারে না। রেড়ির পাতায় পোকা ধরিলে 'লেড ক্রোমেট' নামক ঔষধের জলীয় দ্রবণ পিচকারী দিয়া ছিটাইয়া দিলে পোকা ছাড়িয়া যায়।

ফসল—ছোট বীজবিশিষ্ট রেড়ি জমিতে পুঁতিয়া গাছ জন্মাইলে তাহা হইতে ক্রমাগত ৫ বৎসর ফল পাওয়া যায়। এক বিঘা জমিতে ৭।৮ মণ রেড়ির বীজ জন্মে। রেড়ির চাষ করিতে বিঘা প্রতি ১৫৲ টাকার অধিক খরচ হয় না এবং গড়ে রেড়ি ৬৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইলেও বিঘা প্রতি ৩৩৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

ব্যবহার—রেড়ির তৈল অপরাপর তৈল অপেক্ষা আস্তে জ্বলে। রেড়ির তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং ইহা শরীরের চর্ম্ম ও চুলের গোড়া নরম করে বলিয়া পমেটম প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা রেড়ি হইতে তৈল বাহির করিলে উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া যায়। খাঁটি রেড়ির তৈল জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার খইল অপরাপর তৈলবীজের খইল অপেক্ষা তেজস্কর।

চীনাবাদাম

সাধারণ বিবরণ — চীনাবাদাম সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা মহাদেশেই চাষ হইত। তথা হইতে পৃথিবীর অপরাপর দেশে ইহার চাষ ছড়াইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ এই বাদাম চীন

দেশ হইতে প্রথমে ভারতবর্ষে আনীত হয়; এই কারণে ইহাকে চীনা বাদাম বলা হয়। ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ইহার চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে কর্ণাট, সোলাপুর, সেতারা প্রভৃতি স্থানেও বিস্তর চীনা-বাদামের চাষ হইয়া থাকে। খাদ্য মূল্যের হিসাবে ইহার স্থান খুব উচ্চ। প্রতি বছর বহু লক্ষ মণ চীনা বাদাম ভারত হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। দেশের স্বার্থে ইহার রপ্তানী আশু বন্ধ করা প্রয়োজন; কারণ ইহার বীজ, তৈল ও খৈল সবই পুষ্টিকর সুখাদ্য।

মৃত্তিকা—চীনাবাদাম শুধু বালুকাময় মাটিতে ভাল উৎপন্ন হয়। দোয়াঁশ ও এঁটেল মাটিতে চীনাবাদামের ফলন অনেকটা কম হয়। ইহার চাষে জমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয় না; কারণ ইহা শুঁটি-জাতীয় গাছ। ইহার শিকড় বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করিয়া প্রোটীনে পরিণত করে।

বপনের সময় — বর্ষার দুই মাস ব্যতীত বৎসরের সকল সময়েই চীনা বাদামের চাষ করা যাইতে পারে। ফাল্গুন মাসে চাষ করিলে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে চিনাবাদাম ফলে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আলু চাষের সময় চিনাবাদামের চাষ করিলে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে তোলা যাইতে পারে।

চাষ ও বীজের পরিমাণ—চীনাবাদামের ক্ষেত্রে ৩।৪টী চাষ ও মই দিয়া মাটি তৈয়ারী করিতে হয়। জমির উর্ব্বরতা কম থাকিলে বিঘা প্রতি ৫০ মণ গোবর সার, অথবা ২৫ মণ ছাই ও

এক মণ চূণ, অথবা ২০।২৫ গাড়ি পূকুরের পাঁক দিলে ভাল হয়। গরীব চাষীদের পক্ষে শেষোক্ত প্রকার সারই সহজলভ্য ও সস্তা বলিয়া ব্যবহার করা স্থবিধাজনক।

চীনা বাদামের বীজ ১ ফুট তফাতে ১ ফুট সারিতে বসাইতে হয়। এক বিঘা জমিতে ১০ সের খোলা-সমেত চীনা বাদামের বীজ বপন করা যাইতে পারে।

ফলন—একবিঘা জমিতে সাধারণতঃ ১৫ মণ চীনাবাদাম উৎপন্ন হইতে পারে। প্রতি মণ চীনাবাদাম ৬৲ টাকা হিসাবে বিক্রীত হইলেও ইহা হইতে চাষের খরচ ৩০৲ টাকা বাদ দিয়া বিঘায় ৬০৲ টাকা লাভ হয়।

বাদাম তৈল — চীনাবাদাম হইতে উত্তম তৈল পাওয়া যায়। এক মণ বাদাম হইতে ১৬।১৭ সের তৈল পাওয়া যাইতে পারে। ইহার তৈল খাদ্যরূপে ও অনেক ঔষধে ব্যবহার হয়। ব্যবসায়ীরা নারিকেল তৈলে বাদাম তৈল মিশ্রিত করে এবং কোন কোন দোকানদার বাদাম তৈল ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাবার প্রস্তুত করে। বাদাম তৈল সাবান প্রস্তুত কার্য্যে ও গাড়ীর চাকায় দিবার জন্যও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে বাদাম তৈল জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে সাধারণ ঘানিতেই বাদাম হইতে তৈল বাহির করা হয়। সম্প্রতি কলিকাতায় চীনা বাদামের তৈল নিষ্কাষণের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে বিস্তর চীনাবাদাম কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। অলিভ বা

জলপাইর তৈলে চীনাবাদাম তৈল মিশাইয়া তৈলের উৎকর্ষতা বাড়ানো হইয়া থাকে।

তুলিবার সময়—চীনাবাদাম বপনের পরে ৬ মাসের মধ্যে ফলিয়া থাকে। ইহা আলুর মত গাছের মূলে মাটির মধ্যে জন্মায়। এক বিঘা জমির চীনাবাদাম তুলিতে ১৫।১৬ জন লোকের এক দিনের মজুরী আবশ্যক করে। চীনাবাদামের জমিতে একটি সেচ দিয়া লাঙ্গল দ্বারা মাটি আলগা করিয়া তুলিলে খরচ সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়।

খৈলের ব্যবহার—বাদামের খৈল বড় পুষ্টিকর। গাভীকে বাদামের খৈল খাওয়াইলে উহার দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। চাষের জমিতে বাদামের খৈল একটি উৎকৃস্ট সার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনা বাদামের খৈল মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যের স্থান বহুল পরিমাণে পূরণ করিয়াছিল।

খাদ্য হিসাবে চীনাবাদাম এতই পুষ্টিকর যে, ৯৫ সের গমের ময়দার সহিত ৫ সের চীনা বাদামের ময়দা মিশাইলে জাতীয় খাদ্য-সমস্যারও কিছু সমাধান হইতে পারে। ভারতীয় আইন সভায় মাননীয় মন্ত্রী জয়রামদাস দৌলতরাম এক সময়ে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইহার বহুল প্রচলন যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য কৃষিবিভাগকে নির্দেশও দিয়াছিলেন।

সপ্তম পাঠ

শর্করা জাতীয় উদ্ভিদ

অনেক বৃক্ষ, তৃণ, লতা, ফল মূল ইত্যাদি হইতে আমরা শর্করা জাতীয় মিষ্ট পদার্থ পাই। ইহাদের মধ্যে ইক্ষু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; ভুট্টা, তাল, খেজুর ও বীট প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

(১) **ইক্ষু**—ভারতবর্ষে প্রায় ২০০ রকমের ইক্ষু বা আখ আছে। চিবাইয়া খাইতে কাজলা, ধল সুন্দর, গাণ্ডারী আখ ভাল ; কিন্তু গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিবার পক্ষে অধিকতর রসযুক্ত কোম্বাটুর সি ও হাণ্ডন জাতীয় আখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর আখ জলে নষ্ট হয় না এবং রৌদ্রের তাপেও মরিয়া যায় না। বিঘা প্রতি যতটা আখ জন্মে তাহা হইতে ৪০ মণ গুড় হইতে পারে ; আর কাঁচা আখ ৫০০ মণ পর্য্যন্ত হয়। পানীয় হিসাবে ইক্ষুরস বড়ই উপাদেয় ও বল সঞ্চারক। ইহার বহুল প্রচার হইলে চা, কোকো, কফি প্রভৃতির স্থানীয় ব্যবহার হ্রাস পাইতে পারে এবং ইহাদের রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করিবে।

(২) **খেজুর**—খেজুর গাছ ৫ হাত অন্তর লাগাইলে এক বিঘায় ২০টি সারিতে গাছ জন্মানো যায় অর্থাৎ ২০×২০ =৪০০ গাছ বিঘা প্রতি হয়। প্রতি বৎসরে শীতকালে এই

সকল গাছ হইতে রস আহরণ করিয়া গুড় তৈরী হয়। ইহা অনুর্ব্বর জমির পক্ষে বিশেষ লাভজনক কৃষি।

বাংলার খেজুরের গুড় ভারত-প্রসিদ্ধ। এখানকার হাজারী ও নলেন গুড় এবং তাহার পাটালীর ব্যবসায় খুব লাভজনক।

(৩) **তাল**—বাংলার সমস্ত জেলায় তাল গাছ জন্মায়। উপযুক্ত ব্যবস্থায় তালগাছ কাটিলে তাহা হইতে প্রচুর রস পাওয়া যায়, আর তাহা জ্বাল দিয়া গুড় ও মিছরী পাওয়া যাইতে পারে। এই তালমিছরী খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তালের রস পচাইয়া এক প্রকার দেশীয় মদ্য প্রস্তুত হয়।

(৪) **নারিকেল**—একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য ও তৈলবীজ জাতীয় ফল। নারিকেলের চাষ বহুল প্রয়োজন। সমুদ্রতীরবর্তী লবণাক্ত জমিতে নারিকেল গাছ ভাল জন্মায়, ফলনও ভাল হয়।

প্রশ্ন

১। কোন্ কোন্ উদ্ভিদ হইতে আমরা চিনি পাইতে পারি?
২। তালের মিছরী ও সাধারণ মিছরীর প্রভেদ কি?
৩। কোন্ আখ চিনি প্রস্তুত করিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ?
৪। তালমিছরীর ব্যবহার কি কি?

অষ্টম পাঠ

মসল্লা, শাক, তরি-তরকারি ও পানের চাষ

অনেকের ধারণা যে, ভারতে ধনে, জিরা, যোয়ান, ইস্‌বগুল, তোকমারী, মৌরী, মেথি প্রভৃতি মসল্লাগুলি হয় না ; কিন্তু এই ধারণা ভুল। নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি, যাহাতে বর্ষায় পলিমাটি পড়ে এরূপ জমি হইতে জল শুকাইলে কার্ত্তিক মাসে প্রথম চাষ দিয়া এক মণ রেড়ির খইল ছিটাইয়া মই দিয়া ১৫ দিন রাখিতে হয়। পরে এইসব মসল্লার বীজের সঙ্গে ছাই মিশাইয়া অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই বুনাইয়া দুইবার চাষ দিয়া মৈ দিতে হয়। জিরা বিঘা প্রতি /৬ সের বুনিতে হয় ; ফলন মোটামুটি ৬ মণ হইতে পারে। ইহাদের চাষে জলের প্রয়োজন হয় না ; শিশিরেই গাছগুলি বাড়ে ও ফাল্গুন-চৈত্রে দানা পাকে।

নানাপ্রকার শাক ও তরি-তরকারি বাঙ্গালার প্রতি জেলায় ক্ষেত খামারে ও বাড়ীর আনাচে কানাচে বোনা হইয়া থাকে। লাউ, কুমড়া, নটে, শশা, ঝিঙে, উচ্ছে বুনিলে আমাদের খাদ্য-সমস্যারও অনেকটা সুরাহা হইবে, সন্দেহ নাই। ক্ষেতেও এই সকল তরি-তরকারি উপযুক্ত ব্যবস্থায় জমি চাষ করিয়া বোনা হইয়া থাকে। হিঞ্চে, কলমী, শুশনী প্রভৃতি শাক বাগানে ও পুকুর বা নদীর ধারে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। আমাদের পল্লীর খাদ্য-তালিকায় এই সব শাক-সব্‌জির স্থান তুচ্ছ নহে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় প্রত্যহ কিছু না কিছু কাঁচা শাক বা স্যালাড খাদ্যহিসাবে অবশ্য গ্রহণীয়।

পেঁয়াজ, রসুন, বিবিধ প্রকারের আলু, আদা, হলুদ, লঙ্কা, মরিচ, কলা, আনারস, পান এবং পিঁপুল প্রভৃতি খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে আমাদের কৃষিসম্পদের মধ্যে অতি মূল্যবান্। পেঁয়াজ ও রসুন অত্যন্ত তেজস্কর এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারীও বটে। বিহার ও মধ্য ভারতে এগুলি ভাল জন্মায়। এক সময়ে ঐসব অঞ্চল হইতে এগুলি চালান হইয়া নৌকায় কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আসিত এবং বেলেঘাটা অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত থাকিত। প্রয়োজনীয় কৃষি-পণ্য হিসাবে ইহাদের চাষ এবং বিভিন্ন রুচিকর আহার্য্য প্রস্তুত করিতে ইহাদের ব্যবহার সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে।

আদা এবং হলুদ এক বৎসর বুনিলে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার ফলন পাওয়া যায়। প্রতি বৎসরই উঠান যায় এবং মাটির তলায় সামান্য কাণ্ড ও শিকড় থাকিলেই পর বৎসর আরও বেশী পরিমাণে ফলিয়া থাকে। ৩ বৎসর পরে জমি চাষ দিয়া ঐ ক্ষেত্রে পুনরায় ফসল জন্মানো যাইতে পারে।

লঙ্কা মরিচের চাষও খুব লাভজনক। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর লঙ্কা জন্মিয়া থাকে ; প্রয়োজনের অতিরিক্ত লঙ্কা একটি লাভজনক পণ্যসামগ্রী। পাকা কলা একটি পুষ্টিকর খাদ্য ; আবার তরকারী হিসাবে কাঁচা কলাও একটি মূল্যবান কৃষিপণ্য। ইহা চালান দিয়াও অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে। হুগলী ও হাওড়া জেলার মত অন্যান্য জেলা হইতেও কলা রপ্তানী করিয়া কৃষকগণ যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে।

আনারস, লেবু, বাতাবী-লেবু ও নানাপ্রকার জামীরও বাংলা দেশে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ছায়াযুক্ত স্থানের কৃষিপণ্য হিসাবে ইহাদের চাষ বাড়াইলে আমাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত ফলন বিক্রয় করিয়া আমরা লাভবান হইতে পারি।

পান ও পানের চাষ—পূর্ব বাংলার অনেক জেলায় পানের বর বা বরজ একটি লাভজনক কৃষি ছিল। নদীর উচ্চ তীর ও ছায়াযুক্ত স্থানে পান প্রচুর জন্মে। স্থানীয় ব্যবহারাতিরিক্ত পান চালান যাইত ও পণ্য-হিসাবে তাহার আয় হইতে বহু পরিবার অর্থশালী হইত। ইহার চাষের প্রতি উপযুক্ত যত্নের অভাব ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহার ব্যাধির প্রতিকার না হওয়ায় পানের চাষ বাংলা দেশে প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এদিকে সরকার দৃষ্টি দিলে অনতিবিলম্বে এই চাষের উন্নতি হইবে এবং ইহার ব্যবসায়ে আবার বাঙ্গালী ধনশালী হইতে পারিবে। পানের রস ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকে জীর্ণরস সঞ্চারে সহায়তা করে। কবিরাজী ঔষধেরও অনুপান হিসাবে ইহার ব্যবহার আছে।

প্রশ্ন

১। জিরার চাষে জমিতে সার কি দিতে হয়?

২। কয় মাসে জিরা হয়?

৩। কোন্ কোন্ মসলা বাংলায় চাষ হইতে পারে?

৪। পান চাষ বিষয়ে যাহা জান লিখ।

নবম পাঠ

চাষ-আবাদের কাল নির্ণয়

বিভিন্ন ফসলের চাষ ও আবাদের কাল স্থানীয় বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে। বাংলায় মাঘের শেষ অথবা ফাল্গুন-চৈত্র মাস হইতে কিছু কিছু বৃষ্টি হয় বলিয়া অনেক স্থানে আউস ধান, পাট, তিল, ভূট্টা প্রভৃতি ফাল্গুন-চৈত্র মাস হইতেই লাগান হয়; কিন্তু বর্দ্ধমান বিভাগে এই কার্য্যগুলি ২ মাস পরে করা হয়। পার্ব্বত্য ভূভাগে উচ্চতা ও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে কৃষিকার্য্যের সময় নিরূপিত হয়। দার্জ্জিলিংএর ন্যায় শীতল পর্ব্বতময় স্থানে গ্রীষ্মকালে মহুয়া, ভূট্টা ইত্যাদি গ্রীষ্মের ফসলও লাগান হয়; আবার রবি-ফসলও জন্মান হয়। মোট কথা, ফাল্গুন-চৈত্রে বিভিন্ন ফসলের চাষ করিয়া ফলনানুসারে জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ফসল কাটা হয়। আর নিম্নস্থ পাহাড়ে যখন যে ফসল সুবিধাজনক হয় তাহাই সেই সময়ে লাগায়। বাংলার সমতল ভূমিতে কোন্ মাসে কি কি ফসল লাগাইতে হইবে তাহার একটা মোটামুটি বিবরণ লিখিত হইল :—

বৈশাখ মাসে—আখের ভূঁইয়ে জল দেওয়া, লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, করলা, উচ্ছে, কাঁকুড়, ওল, আদা, হরিদ্রা ইত্যাদির বীজ লাগান হয়। ভূট্টা, আউস ধান, ধইঞ্চা, অড়হর, পাট, মেথা, যুয়ান, বিয়ানা ঘাস ইত্যাদির বীজ বপন করা হয়। তুঁত, বাঁশ,

কলা, মাদুর-কাটি প্রভৃতির জমিতে শুষ্ক পাঁক-মাটি ছিটাইয়া সার দেওয়া হয়। বেগুনের জমি প্রস্তুত করা হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে—আউস ধান, ভূট্টা, বরবটি, সয়াবিন, সিম, যোয়ার, ধইঞ্চা, অড়হর, বিয়ানা ঘাস ও পাটের বীজ বপন। ভারি বৃষ্টির পরই বেগুন ও কাপাসের চারা ভাটি হইতে মাঠে যথাস্থানে লাগান। চৈত্র মাসে লাগানো ভূট্টা, যোয়ার ও চিনাবাদামের গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া। লাউ, কুমড়া, শশার বীজ বপন। আমন ধানের বীজ বপন এবং আমন ধানের জমি প্রস্তুতকরণ। ফলাদির বৃক্ষ রোপণ।

আষাঢ় মাসে—বেগুন, কার্পাস ও বাঁশের মোথা লাগান। বৃক্ষরোপণ, আমন ধানের শেষ জমি প্রস্তুতকরণ, পাট, অড়হর ও আশু ধান নিড়ান। আমনের বীজ বপন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের লাগানো বেগুন ও কার্পাসের চারায় মাটি দেওয়া, জল বাহির করা, নালা প্রস্তুত করা। টমেটো বা বিলাতী বেগুন, ঢ্যাঁড়স বা ভিণ্ডির বীজ বপন ; শাক ও সীমের বীজ বোনা। কচু, হলুদ, এরারুট, আদা, সাদা ও রাঙা আলুর লতা, শাক আলুর বীজ, ঝিঙা, শশা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বীজ বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত লাগান যাইতে পারে। আমন ধান রোপণ, মাদুর কাটি ও সিনি, নেপিয়ার জাড় লাগান এবং সয়াবিনের বীজ পোতা।

শ্রাবণ মাসে—আমন ধান, লঙ্কার চারা, বাঁশ, নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ ; কার্পাস গাছ নিড়ান। আদা, হলুদ,

বেগুন ও কচু গাছের গোড়ায় মাটি বাঁধা। পাট ও অড়হর নিড়ান; কাঁচা ভূট্টা বিক্রয়। আখের ক্ষেতে আখের গোড়ায় মাটি দেওয়া; আখের ক্ষেত্রের জল বাহির করার নালা কাটা ও প্রথম পাতা বাঁধা। আউস ধান কাটা, আনারস বিক্রয় ও তাহার নূতন চারা লাগান।

ভাদ্র মাসে—আউস ধান কাটা; যোয়ার, অড়হর, সীম, বিয়ানা ও নেপিয়ার প্রভৃতি গরুর খাদ্য কাঁচা অবস্থায় কাটা; বেগুন বিক্রয় আরম্ভ; পাট জাগ দেওয়া। পৌষ মাসে লাগানো ওল উঠাইয়া বিক্রয় করা।

আশ্বিন মাসে—বর্ষা শেষ হইয়া গেলে রবি-শস্যের জন্য জমি প্রস্তুত করা; ভূট্টা, আউস ধান ও ঘোড়ামুগ কাটা, আখের দ্বিতীয় বার পাতা বাঁধা। সীম, মটর, সয়াবিন, পালং শাক, মূলা, ভূঁয়ে শশা, কুমড়া, পাটনাই কপি, সরিষা, শালগম, পেঁপে, কলা ও অন্যান্য কলমের গাছ লাগানো। বিলাতী সব্জীর জন্য ভাঁটা তৈয়ার করা। রবি-শস্যের জন্য পুনঃ পুনঃ জমি চাষ দিয়া রাখা। বিলাতী সব্জীর জন্য জমি প্রস্তুতকরণ।

কার্ত্তিক মাসে—কার্পাস ও বেগুনের গোড়া খোঁড়া; নূতন লাগানো ফলের গাছের গোড়া বাঁধা; যব, যই, মুগ, কলাই, মটর ও গমের বীজ বোনা। আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ বোনাও চলে। কপির চারা যথাস্থানে লাগান। তরমুজ, খরমুজ, মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শশা, পেঁয়াজ ও বরবটির বীজ বপন। এইগুলি পূর্ব্বমাসে বোনা হইয়া থাকিলে নিড়াইয়া

কোপাইয়া দেওয়া ; ইক্ষু ও বিলাতী সব্জীতে জল দেওয়া অন্ততঃ সপ্তাহে এক দিন। বেগুন, কপি, লঙ্কা ইত্যাদি চয়ন।

অগ্রহায়ণ মাসে—বিলাতী সব্জীর বীজ, বিলাতী বেগুন (টমেটো), মূলা, পেঁয়াজ, বিলাতী মটর, সয়াবিন, সীম, আলু, পটোল, সাদা ও রাঙ্গা আলুর বীজ লাগান। গত মাসের লাগানো কপির চারা চালাইয়া দেওয়া, বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা ; আখ, কার্পাস ও বেগুনের ক্ষেত খুঁড়িয়া দেওয়া ; পেঁপে, কলা, বাঁশের গোড়ায় মাটী আগলা করিয়া দেওয়া। রবি শস্য বপনের জন্য জমি প্রস্তুত করা ; প্রস্তুত থাকিলে আগ্‌তি বোনা। সরিষা, কলাই সর্ব্বপ্রথমে, পরে ছোলা, মটর, সয়াবিন, মসিনা, তিল, খেসারী, মুসূরী ও মুগ প্রভৃতির বীজ বপন করা।

পৌষ মাসে—আমন ধান কাটা ; বিলাতী সব্জী বিক্রয় ; আলু ও কপিতে জল দেওয়া ; গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া ; যব, গম ইত্যাদি রবি-শস্য নিড়ানো ; বেগুন, লঙ্কা, কার্পাস চয়ন ও বিক্রয়। ওল, চুপড়ী আলু, আদা, হলুদ, চিনাবাদাম খুঁড়িয়া তোলা ; ভাদ্র মাসে লাগান ওল তোলা। ইক্ষু কাটা আরম্ভ ; চাঁপা-নটে শাক বোনা ; পটল, শিমূল, আলু ও এরারুট তোলা।

মাঘ মাসে—আখ কাটা ও গুড় প্রস্তুত করা ; দেশী পেঁয়াজ ও কুলী বেগুন লাগান ; শিমূল আলু ও ওলমুখী লাগান ; যো পাইলে আমনের জমি চাষ করা। মটর ও সরিষা কাটা। আখ, ভূঁয়ে ঝিঙা, উচ্ছে, লাউ ইত্যাদির ফসল লাগানর জন্য

জমি প্রস্তুত করা। শিমূল আলু, এরারুট উঠান। বিলাতী সব্জী বিষয়ে সারের জন্য মাটি তৈয়ারী করা।

ফাল্গুন মাসে—মসল্লা, মুগ ও তিল কাটা; ইক্ষু কাটা; গুড় প্রস্তুত করা; ইক্ষু লাগান; উচ্ছে, ঝিঙা, তরমুজ, খরমুজ, লাউ, কুমড়ার বীজ বপন। কুলীবেগুনের চারা লাগান। "যো" পাইলে আউস, আমন ধান, পাট, ভূট্টা ইত্যাদির জন্য জমি প্রস্তুত করা। আলু, কার্পাস ও পটল উঠানো।

চৈত্র মাসে—যব, গম, যোয়ার, ছোলা, মসূর, খেসারী, মুগ ইত্যাদি রবিশস্য তোলা; ঝাড়াই ও মাড়াই করা; আখ লাগান, সার ও জল দেওয়া। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা ইত্যাদি গাছে জল ও সার দেওয়া। আলু ও কার্পাস তোলা; ক্ষেতে সার দেওয়া; ধান ও পাটের জমি তৈয়ারী করা।

———

পরিশিষ্ট

(১)

বাংলায় কৃষির উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি কৃষিগণের অবশ্য করণীয়—

(ক) পলিমাটির অভাব হওয়ায় সমস্ত জমিতেই সরকার কর্ত্তৃক বিতরণ-করা বৈজ্ঞানিক সার দেওয়া উচিত। গৃহপালিত গো, মহিষাদির মৃত দেহের হাড়গুলি বহু মূল্যবান্ সার। এইগুলি কেহ সংগ্রহ করিয়া না লইয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে পুঁতিয়া রাখা উচিত। মনে রাখিতে হইবে, এক রকম বিনামূল্যেই সংগৃহীত হইয়া আমাদের দেশ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ৭॥ মণ হাড় বিদেশে চালান হইয়া যায়।

(খ) কচুরীপানা পোড়াইয়া বা মাটি চাপা দিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া শেষে সেই 'কম্পোষ্ট' সার জমিতে ব্যবহার করিতে হইবে। প্রায় বিনা মূল্যেই ইহাতে জমি উর্ব্বর হইবে।

(গ) উঁচু জমিতে খাল কাটিয়া ফসলের জমিতে আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে এবং নিচু জমি হইতে নালা করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিতে হইবে।

(ঘ) সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও প্রবর্ত্তিত উন্নত জাতের ধান, পাট, আখ, আলু ইত্যাদির উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া কৃষকগণের স্ব স্ব জমিতে ব্যবহার করিতে হইবে।

(ঙ) পাটের পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব ইক্ষুর ও ধানের চাষ বাড়াইতে হইবে। তবে শিল্পপ্রধান অঞ্চলে পাটের চাষ লাভজনক বলিয়া সরকার ইদানিং পাট চাষের আগ্রহ দেখাইতেছেন।

(চ) উঁচু জমি, যেখানে জল উঠে না, বা বৃষ্টি হইলেও জল দাঁড়ায় না, এইরূপ ঢালু দোআঁশ জমিতে সয়াবিন নামক মটরজাতীয় ডা'ল চাষ করিতে হইবে। উহা ভিটামিন-বিশিষ্ট আমিষ-প্রধান খাদ্য। ইহা হইতে আটা, রুটী, দুগ্ধ, ছানা, ডাল ইত্যাদি বহু পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হইবে।

(ছ) গো, মহিষাদির জন্য নেপিয়ার ঘাস, জাপানী মিনিয়েট ইত্যাদি ঘাষের চাষ করিতে হইবে এবং প্রতি গ্রামে যথাসম্ভব গো-চারণ ভূমি রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(জ) কো-অপারেটিভ সোসাইটী বা সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া প্রতি মাঠের সমগ্র জমিই একত্র করিয়া একসঙ্গে চাষ করিতে হইবে। আজ বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন। দেশের শিক্ষিত যুবকদের কোদালী ধরিতে হইবে। স্বাস্থ্যোন্নতি ও জীবিকার্জনের জন্য অন্যান্য বৃত্তিতে আর বৃথা সময় ব্যয় না করিয়া উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্যে তাহাকে ব্যাপৃত হইতে হইবে। তাহা হইলে বিদ্যা, কৃষ্টি ও কৃষি এই তিনের সমন্বয়ে বাঙ্গালী পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে; বাঙ্গালী জাতি ভারতে আবার গৌরবের স্থান পাইবে।